

মার্চ ২০২১ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭

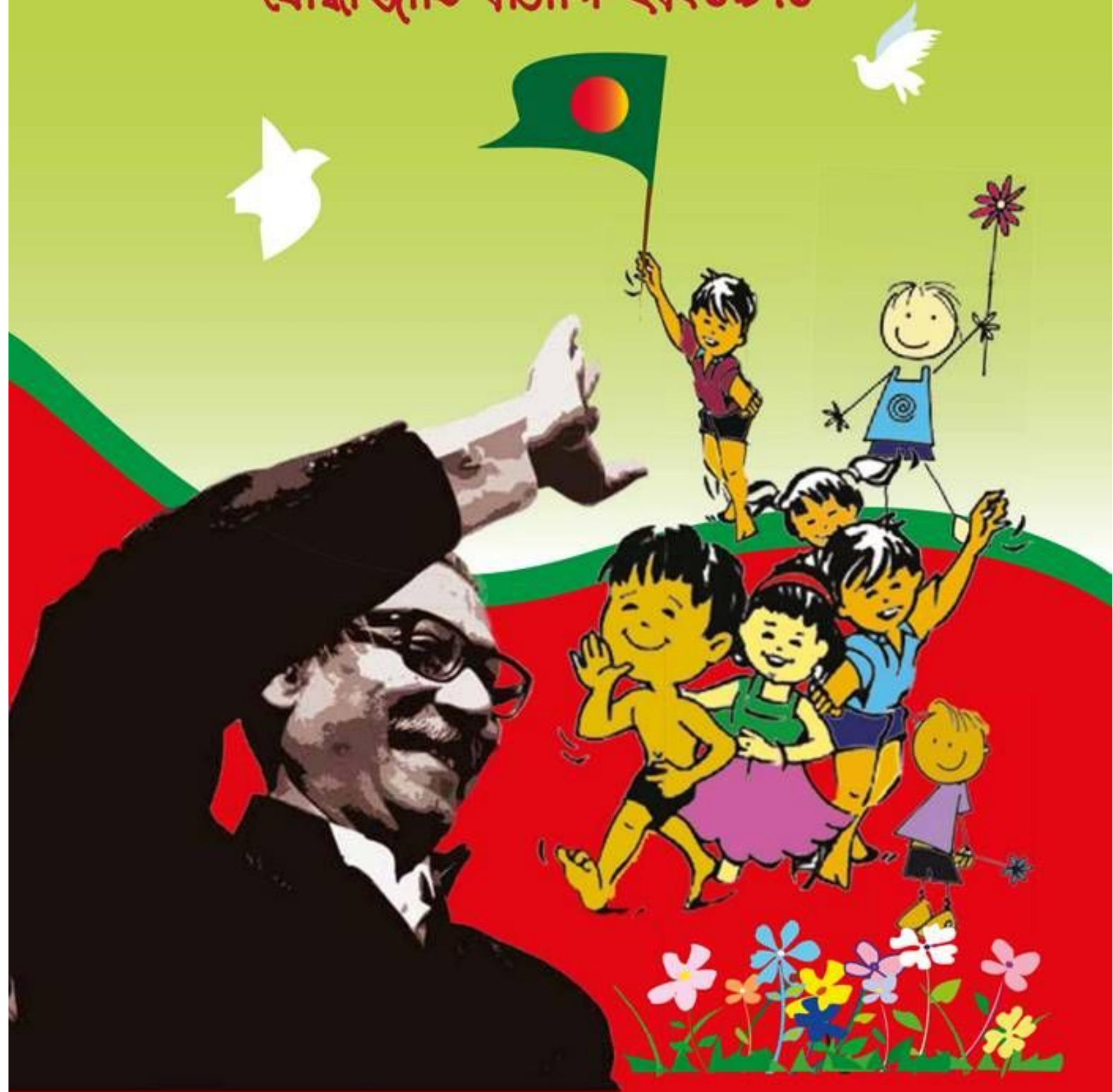
# নবাবু

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা



## যোদ্ধা জাতি বাঙালি এবং ১৯৭১





মোছা. লামিয়া পারভীন, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা



সৈয়দ ফারহান জীম, অষ্টম শ্রেণি, সানিডেইল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

# বাবা

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা  
মার্চ ২০২১ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭

স্বাধীনতার  
৫০ বছর





## সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, এসে গেছে অগ্নিঝরা মার্চ মাস। এবারের মার্চ মাস নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েছি। এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নই তিনি দেখেছিলেন। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ৭ই মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (যা বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণ দেন; সেই ভাষণে জাতি স্বাধীনতার ডাক পায়। ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ এখন বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ, বিশ্বের সম্পদ। ২৫শে মার্চ ১৯৭১, রাতের আঁধারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। এই শিশু দিবসে সকল শিশুর প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই মার্চ মাসেই আমাদের প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেশকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর দেশপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। তিনি ছিলেন বিশ্ব বরেণ্য মহান নেতা।

২৬শে মার্চ বাঙালি এ বছর উদযাপন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মুজিববর্ষ উদযাপন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। সেইসাথে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। যা জাতিকে উজ্জ্বলিত করেছে। তোমরাও খুব খুশি তাই না ছোট্ট বন্ধুরা?

ভালো থেকে বন্ধুরা। অবশ্যই নবাবরণের সাথেই থাকবে। আর নবাবরণ পড়ে মতামত জানাবে।

প্রধান সম্পাদক  
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক  
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক  
শাহানা আফরোজ  
মো. জামাল উদ্দিন  
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক  
সুবর্ণা শীল  
অঙ্করণ  
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী  
মেজবাউল হক  
সাদিয়া ইফফাত আঁখি  
মো. মাহুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা  
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর  
তথ্য ভবন  
১১২, সার্ভিস হাউস রোড, ঢাকা-১০০০  
ফোন : ৮৩০০৬৮৮  
E-mail : editormobanun@dfp.gov.bd  
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ  
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)  
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর  
তথ্য ভবন  
১১২, সার্ভিস হাউস রোড, ঢাকা-১০০০  
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিরাসে প্রিন্টিং আন্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

যোদ্ধা জাতি  
বাঙালি  
এবং  
১৯৭১



অন্য দেশ দখল করে বাঙালি তার সামরিক শক্তি কোনোদিনই দুনিয়াকে দেখাতে যায়নি। সেদিক থেকে বাঙালিরা বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও ভদ্র যোদ্ধা জাতি, তাদের তেজ, বল ও অস্ত্র গ্রহণের শক্তি ধাকা সত্ত্বেও কখনো পশুশক্তি হয়ে যায়নি তারা। তবে তাকে কেউ আঘাত করতে এলে সে ছেড়ে দেয়নি। হাজার হাজার বছর আগে আর্যদের ছেড়ে দেয়নি, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদেরও ছেড়ে দিল না বাংলার মানুষ। পালিয়ে বাঁচতে হলো শত্রুদের। এ নিয়ে নিবন্ধ পড়ো পৃষ্ঠা ৫-৮



### নিবন্ধ

- ০৫ যোদ্ধা জাতি বাঙালি এবং ১৯৭১/ড. মোহাম্মদ হাননান
- ০৯ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শিততোষ চলচ্চিত্র/ অনুপম হায়াৎ
- ২৫ ঐতিহাসিক ভাষণের সুবর্ণ জয়ন্তী/মো. ইকবাল হোসেন
- ২৭ জাতীয় শিশু দিবস/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
- ২৯ শিশুবন্ধু বঙ্গবন্ধু/ফারিহা হোসেন
- ৩৫ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু/জায়েদুল আলম
- ৩৮ রোগজয়ী বঙ্গবন্ধু/আসিফ আহমেদ
- ৪২ বিশ্বজুড়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন/মো. জামাল উদ্দিন
- ৫৪ সাড়ে তিনশো বছর আগের লকডাউন/শাহানা আফরোজ
- ৫৫ মজাদার আইসক্রিম কোন/আহমেদ রিয়াজ

### গল্প

- ১১ মনে রাখার দিন/ঋণা দাস পুরকায়স্থ
- ১৬ তিন কন্যা/মনি হায়দার
- ৩২ খোকার জন্মদিন/রফিকুর রশীদ
- ৪৪ পিপি/এস আই সানী
- ৫০ আরেক যুদ্ধ/মুস্তাফা মাসুদ
- ৫৭ খটকা লাগানো শব্দ/নাসীমুল বারী
- ৫৯ মুক্তিসেনা/এম এম জাকারিয়া জামি

### সাফল্য প্রতিবেদন

- ৬২ গিনেস বুক শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু/মেজবাউল হক
- ৬৩ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁথি
- ৬৪ বিশ্বরেকর্ড গড়তে আলপনা/মিনহাজুল আবেদীন

### ছোটদের ছড়া

- ২৬ আহুত্যাগ/মো. আবিব হোসেন
- ৪০ আমার দেশ/আরিফ হাসান
- ৬১ বঙ্গবন্ধু/মো. আবু বকর
- ৬১ সোনার বাংলাদেশ/সাকিবুল ইসলাম
- ৬১ আমার স্বাধীনতা/মো. রিফাত হোসেন
- ৬১ স্বাধীনতা/ রুপা আক্তার



### বড়োদের কবিতা

- ০৪ মার্চ/কামাল চৌধুরী
- ২৩ স্বাধীনতা দীপ্ত অহংকার/মুহাম্মদ ইসমাইল
- ২৩ বঙ্গবন্ধু/মো. সাখাওয়াত তালুকদার
- ২৩ স্বাধীনতা তুমি/মো. হাসু কবির
- ২৪ লাল-সবুজের পতাকায়/আহমেদ শামীম
- ২৪ মায়ের ছেলে/অজিত রায় ভজন
- ২৪ সোনার স্বদেশ গড়তে/সুমন বনিক
- ২৬ মার্চের দিন/মোহাম্মদ ইলিয়াছ
- ২৬ ধন্য সবাই ধন্য/নুসরাত জাহান

### স্মৃতিকথা

- ২১ বীরপ্রতীকের বীরত্ব/ মিয়াজান কবীর

### বই আলোচনা

- ৪১ বইয়ে বইয়ে বঙ্গবন্ধু/পিয়াল খান

### ছোটদের আঁকা

- দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: মোছা. লামিয়া পারভীন/ সৈয়দ ফারহান জীম
- ২৮ প্রিয়তা মেহজাবিন
- ৩৪ ঐশি দফাদার
- ৪৩ মো. ইহসানুল হক বসুনীয়া (সিফাত)



## মার্চ কামাল চৌধুরী

আকাশে বাতাসে মার্চের বরাডয়  
মার্চ এসে গেছে জনতার চিৎকারে  
প্রতিবাদী দেশ, প্রতিবাদী জনগণ  
মার্চ এসে গেছে বাংলার ঘরে ঘরে।

মার্চ এসে গেছে হাজারো নদীর শ্রোতে  
নৌকোজীবন, লৌকিক সাম্পানে  
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর তীরে  
মার্চ এসে গেছে মহামুক্তির গানে।

আমার ঠিকানা নদ-নদীদের দেশে  
পিতৃপুরুষ বাঙালি মাছে ও ভাতে  
তবুও আমার শ্যামল শরীর রাগী  
মার্চ এসে গেছে শব্দিক পদাঘাতে।

মার্চ এসে গেছে প্রতিরোধী লাঠি হাতে  
সবুজে ও লালে মানচিত্রের রোদে  
দুহাতে নতুন প্রাণের পতাকা নিয়ে  
মার্চ এসে গেছে কোটি মানুষের ক্রোধে।

মার্চ এসে গেছে রেসকোর্স মাঠে আজ  
লক্ষ জনতা; ভয় কী বন্ধু জাগো  
মুজিব নামের রাখাল রাজার ডাকে  
স্বাধীন পতাকা উড়ছে আকাশে মাগো।

মার্চ এসে গেছে শেখ মুজিবের নামে  
মার্চের ভাষা সাহসের তর্জনী  
জনসমুদ্রে স্বাধীনতা স্বাধীনতা  
আকাশে বাতাসে জয়বাংলার ধ্বনি।

ওরা ভেবেছিল হত্যাশেষ কথায়  
পাকি হানাদার গণহত্যায় মাতে  
রুমি নজরুল লাখে শহিদের খুনে  
মার্চ এসে গেছে যুদ্ধ অস্ত্র হাতে।

এই মার্চ মানে মুক্তি ও স্বাধীনতা  
এই মার্চ মানে বাঙালির জয়গান  
স্বদেশ আমার, সাহসে ও সংগ্রামে  
আমরা সবাই মার্চের সন্তান।



## যোদ্ধা জাতি বাঙালি এবং ১৯৭১

ড. মোহাম্মদ হাননান

তোমরা কি মনে করো, বাঙালিরা ১৯৭১ সালেই প্রথম অস্ত্র ধরেছিল? একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, বাঙালিরা ভীতু আর ভেতো। এরা শুধু ভাত খায় আর ভয় পায়। এই মন্তব্যগুলো শুধু তাদের, যারা বাঙালিদের আসল ইতিহাস জানে না। বাঙালিরা এই ১৯৭১ সালেই প্রথম অস্ত্র ধরেছে, এ-কথাও সত্য নয়। এসো তাহলে, ইতিহাসের গোড়ায় গিয়ে হাত দিই, যুগে যুগে বাঙালি অন্যায়ে বিরুদ্ধে এবং নিজেদের অধিকারের লড়াইয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে কীভাবে যুদ্ধ করেছে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করি।

হাজার বছর আগে আর্যরা যেদিন প্রথম এসেছিল ভারতে, তখন বাংলাদেশে ঢুকতে গিয়ে বাঙালিদের পূর্ব পুরুষদের কাছে তাদের হার মানতে হয়েছে।

এর অনেক অনেক দিন পরের কথা। আটশত সাল। অর্থাৎ আজ থেকে বারোশ বছর আগের ইতিহাস। বাংলাদেশে তখন পাল-রাজারা ক্ষমতায়। তাদের বিরুদ্ধে কৈবর্ত-কৃষকরা মহান নেতা দিব্যাকের নেতৃত্বে অস্ত্র ধরে ক্ষমতা পর্যন্ত সেদিন দখল করে নিয়েছিল।

এরপর ১৭৬৪ সালে সন্দ্বীপ, ১৭৮৩ সালে রংপুর, ১৭৯২ সালে বাকেরগঞ্জের জনগণ তাদের আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে বিদ্রোহ করে অস্ত্র ধরে।

১৭৬৩ সালে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং ১৭৮২ ও ১৭৯৯ সালে সিলেটে ও

১৭৮৭ সালে কুমিল্লায় 'ফিরিসি খেদাও' আন্দোলন চরম আকার

ধারণ করেছিল। ১৭৬৭ সালে সিলেট-ত্রিপুরা অঞ্চলে সমসের

গাজীর নেতৃত্বে কৃষকরা সশস্ত্র যুদ্ধ করে গরিব মানুষের

রক্ত কায়ম করে ফেলেছিল।



তিতুমীরের বাঁশের কেন্দ্র

১৮২৪ সালে ময়মনসিংহে পাগল বিদ্রোহ, ১৮২৪ সালে টিপু শাহর নেতৃত্বে সুসং বিদ্রোহ, ১৮৩১ সালে ওয়াহাবি আন্দোলন এবং তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সেই মহান যুদ্ধের কথা তোমরা অনেকেই বিভিন্ন গল্পকথায় পড়েছে।

১৮৫৮ সালে তুখালী বিদ্রোহ, ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহ, ১৮৭৩ সালে পাবনা বিদ্রোহ ইত্যাদিতে জমিদার কিংবা রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাঙালি জনগণ অস্ত্র হাতে লড়াই করেছে।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভারতে সিপাহিরা যে বিদ্রোহ করেছিল, তাতে বাংলাদেশের মানুষও জড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকা ছিল এ বিদ্রোহের একটি বড়ো কেন্দ্র।

১৯০০ সাল থেকে অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে বাংলার তরুণ যুবকরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম শহরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে সূর্য সেন বাংলায় একটি স্বাধীন দেশ গঠন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এছাড়াও ১৯২২ ও ১৯৪৯ সালে নানকার বিদ্রোহ, ১৯৩৭ ও ১৯৪৯ সালে নেত্রকোণায় টঙ্ক আন্দোলন, ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৯ সালে নাচালের কৃষক বিদ্রোহে বাংলাদেশের মানুষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে।

তাহলে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? ১৯৭১ সালেই প্রথম নয়, এই বাঙালি, যুগে যুগে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার জন্যে বার বার

অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে। বাঙালি ভীকু নয়, বরং যোদ্ধা জাতি।

তবে হ্যাঁ, অন্যের দেশ দখল করে বাঙালি তার সামরিক শক্তি কোনোদিনই দুনিয়াকে দেখাতে যায়নি। সেদিক থেকে বাঙালিরা বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও ভদ্র যোদ্ধা জাতি, তাদের তেজ, বল ও অস্ত্র গ্রহণের শক্তি ধাকা সত্ত্বেও কখনো পশুশক্তি হয়ে যায়নি তারা।

তবে তাকে কেউ আঘাত করতে এলে সে কাউকে ছেড়ে দেয়নি। হাজার হাজার বছর আগে আর্যদের ছেড়ে দেয়নি, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদেরও ছেড়ে দিল না বাংলার মানুষ। পালিয়ে বাঁচতে হলো শত্রুদের।

### [ দুই ]

তোমাদের এখন আমি বলব সেই দিনটির কথা, যে-দিনে আমরা মুক্তি পেলাম, স্বাধীন হলাম। সেদিন ছিল ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল। ভারতের সৈন্য ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথবাহিনী সমগ্র ঢাকা শহর ঘেরাও করে ফেলল। ভারতের একজন সেনাপতি ঢাকায় পাকিস্তানের সেনাপতি আবদুল্লাহ খান নিয়াজিকে এদিন সকাল সাড়ে আটটায় একটি চিঠি লিখলেন,

প্রিয় আবদুল্লাহ

আমরা এসে পড়েছি...। তোমার সব বাহাদুরি আর খেলা আজই শেষ।... বুদ্ধিমানের মতো আত্মসমর্পণ করা।...





বিকেল তখন সাড়ে চারটা। চিঠির জবাব এল। আর কোনো পথ না-পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা 'নাকে খত' দিল। রেসকোর্স ময়দানে, যেখানে সে-বছরই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', ঠিক সেই জায়গাটিতেই পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া হলো। ওরা লিখল— বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর কাছে আমরা পাকিস্তানি বাহিনী হেরে গেছি। তাই আত্মসমর্পণ করলাম।

মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ ক্যাপটেন এ.কে. খন্দকার ও মেজর হায়দার এবং ভারতের জেনারেল অরোরা স্বাক্ষর-অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন।

যেই মাত্র পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের খবর এসে পৌঁছল, সেই মাত্র সারাদেশের লক্ষ কোটি মানুষ বিজয় উল্লাসে রাস্তায় নেমে পড়ল, 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। মুক্তিযোদ্ধারা আকাশের দিকে তাকিয়ে রাইফেলের গুলি ছুড়তে থাকল। যে যাকে সামনে পাচ্ছে, বুকের মধ্যে আনন্দে চেপে ধরছে।

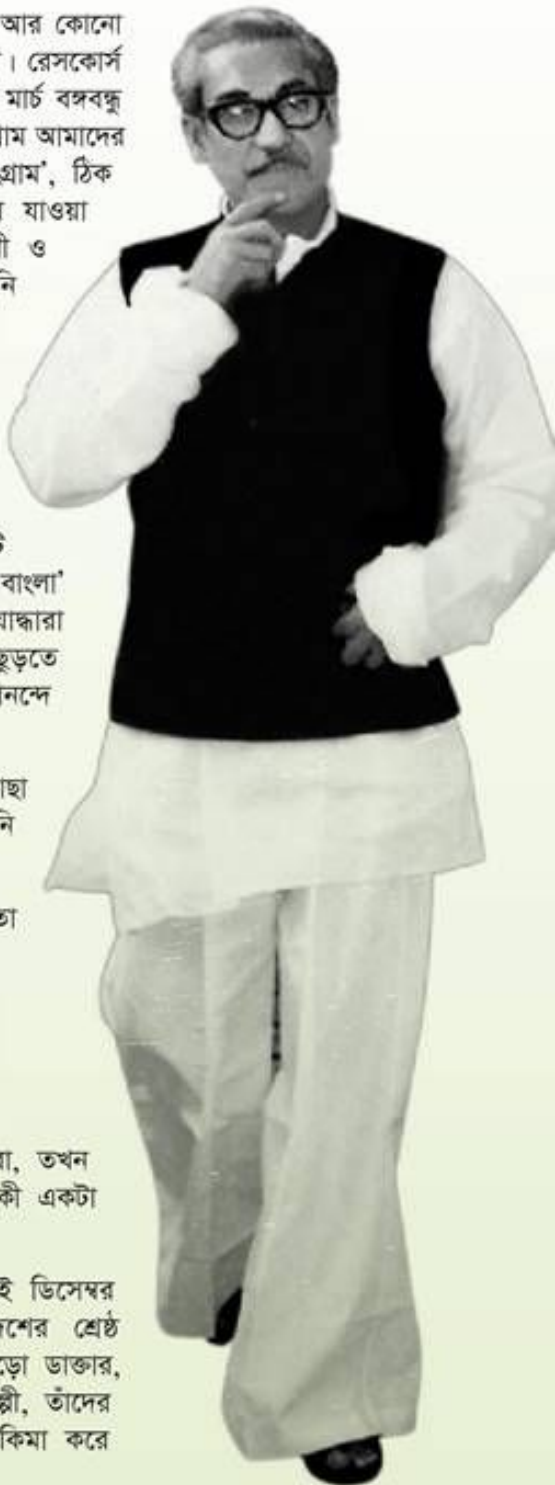
ভারতীয় সৈন্যদের সামনে পেলেই লোকে ফুলের গোছা ছুড়ে দিচ্ছে। আর যদি দূরে দেখতে পায় পাকিস্তানি একটা সৈন্য যাচ্ছে, তাহলে ছুড়ে দিচ্ছে থুতু।

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে তখন একটি কবিতা আবৃত্তি হচ্ছিল—

আজ সৃষ্টি সূখের উল্লাসে  
মোর মুখ হাসে মোর— চোখ হাসে মোর  
টগবগিয়ে খুন হাসে।  
আজ সৃষ্টি সূখের উল্লাসে।

বাংলার মানুষ যখন বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা, তখন তারা জানত না তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কী একটা দুঃসংবাদ!

বিজয় দিনের মাত্র একদিন আগে অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী হত্যা করে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার, সবচেয়ে ভালো সাংবাদিক, সবচেয়ে ভালো শিল্পী, তাঁদের ধরে নিয়ে আলবদররা জবাই করে, তারপর কিমা করে



তাদের মেরে ফেলে। জামায়াতে ইসলামী ছাত্র সংঘের আলবদররা কি মানুষ ছিল! এসব কি মানুষের কাজ! আলবদরদের হাতে প্রাণ হারান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারসহ শত শত বুদ্ধিজীবী।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ নামে আমাদের দেশের একজন জননেতা ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের জানালেন: আলবদররা যখন পালিয়ে যায়, তখন তাদের অফিসে এক বস্তা বোঝাই চোখ পাওয়া গিয়েছিল। বোঝা যায়, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় খুনিরা সেদিন হত্যা করেছিল

সব আনন্দ বন্ধ হয়ে গেল।

'কাদো দেশবাসী কাদো, বলে সব বাঙালি বুক ভাসিয়ে ফেলল।

বাংলাদেশের একজন কবি, শামসুর রাহমান একটি কবিতা লিখে খুনিদের অভিশাপ দিলেন—

... আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত-গোধূলিতে  
অভিশাপ দিচ্ছি।...

যারা গণহত্যা করেছে  
শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,  
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়েদের চেয়েও অধিক  
পত্ত সেইসব পত্তদের।...

বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাজার বছর ধরে বাঙালিদের চিন্তা-ভাবনা ও সংগ্রামের ফসল ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে যা বাস্তবতা লাভ করেছে। শত শত শহিদ মা, বোন ও ভাইয়ের রক্তে এসেছে এ স্বাধীনতা। ৩০ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এ স্বাধীনতার জন্য। তাই আমাদের সবার এ প্রণতি—

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে  
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা  
আমরা তোমাদের ভুলব না  
আমরা তোমাদের ভুলব না... ■

লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক ও গবেষক



অবশেষে নাকে খত দিয়ে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি

নিবন্ধ

## মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র অনুপম হায়াৎ



পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে পরিচিত। যারা এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। সরকার তাদের 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১৯৭১ সালের এই মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শত শত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছড়া, গান, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র, স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নানা বীরত্বগাথা, পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা-ধ্বংস-নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায় বই-পত্রিকা-বেতার-টেলিভিশন-মঞ্চ-জাদুঘর-চলচ্চিত্র থেকে।

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা নিয়ে বেশ কটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৭১ সালের যুদ্ধ চলাকালেই। সেগুলো ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র। এসব চলচ্চিত্র ছিল—জহির রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড' (গণহত্যা বন্ধ করো), এ স্টেট ইজ বর্ন (একটি রাষ্ট্রের জন্ম), আলমগীর কবির পরিচালিত 'লিবারেশন ফাইটারস' (মুক্তিযোদ্ধা), বাবুল চৌধুরী পরিচালিত 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস' (নিরপরাধ লক্ষ জনতা)— এই চারটি চলচ্চিত্রকে বলা হয় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র। এর মধ্যে 'লিবারেশন ফাইটারস' চলচ্চিত্রে একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা যায় বয়স্ক এক মুক্তিযোদ্ধার সাথে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতে। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর চাষী নজরুল ইসলাম ১৯৭২ সালে 'ওরা ১১জন' নামে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম কাহিনিচিত্র বানান। এই চলচ্চিত্রে বড়োদের সাথে কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা যায় শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে।

মুক্তিযুদ্ধে শিশু-কিশোরদের অবদান নিয়ে প্রথম এককভাবে একটি কাহিনিচিত্র বানান হারুনুর রশিদ। ছবিটির নাম 'আমরা তোমাদের ভুলবো না'।

হারুনুর রশিদ (জন্ম ১৯৪০) পরিচালিত শিশু-কিশোর উপযোগী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'আমরা তোমাদের ভুলবো না' মুক্তি পায় ১৯৯০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশনে। এটি ছিল বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রযোজিত এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিকল্পধারার প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র। হারুনুর রশিদ এর আগে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি চিত্রময় কাব্যধর্মী চলচ্চিত্র 'মেঘের অনেক রং' (১৯৭৬) নির্মাণ করেছেন।

ছবির কাহিনি: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বাংলাদেশের একটি গ্রামাঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের স্বাসরুদ্ধকর ঘটনা। এই প্রতিরোধের সংগঠক হলো একটি কিশোর। যার বাবা-মাকে বর্বর পাকবাহিনী বাড়ির আঙিনাতেই গুলি করে। ওরা দুই ভাই পালিয়ে বেঁচে যায়। কিশোরটির নাম মতলব। ওর বড়ো ভাই ঢাকায় একটি কলেজে পড়ত। থাকত হলে। ২৫শে মার্চের কালরাতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে হেঁটে কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে নিজ গ্রামে চলে আসে। সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হলে এ গ্রামের মানুষেরা গ্রামে ঢোকান প্রবেশ পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ওরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে স্বাধীনতার চেতনায় শাণিত হয়। মানুষ প্রাণের ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটে পালায়। ওরা একজন বয়োবৃদ্ধ শ্বেতশব্দ শূশ্রুমণ্ডিত লোককে কাফের বলে হত্যা করে। তারপর চলে নির্বিকার গণহত্যা, ধর্ষণ। কিশোর মতলব ঘরের মধ্যে পানির মটকায় ডুবে থেকে প্রাণে রক্ষা পায়।

চারদিক নিস্তরক হলে ও মটকা থেকে বের হয়ে দেখতে পায় নিখর, নিশ্চল পাথরের মতো পড়ে আছে ওর বাবা ও মা। এই হামলার পরপরই গ্রামের তরুণরা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে সীমান্তের ওপারে যায়। গ্রামে যুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় শিক্ষিত, সং মানবতাবাদী ডাক্তার সাহেব। এরই মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মুখে ধর্মের কথা বলে পাকবাহিনী অনুগত দালালের ভূমিকায় সক্রিয় হয়। ওরা সন্দেহবশত অনেক তরুণদের ধরিয়ে দেয় পাকবাহিনীর হাতে। ওদের উপর চলে অত্যাচার ও তারপর হত্যা।

মা-বাবা হারা মতলব ডাক্তার সাহেবের আশ্রয়ে থাকে। তার কাছ থেকে ও জানে মুক্তিযোদ্ধা কারা এবং গেরিলা যুদ্ধ কী ইত্যাদি। মতলবের সচেতনতা বাড়ে। সে গ্রামের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত হাই স্কুলে ওঠে। ঘোরাফেরা করে। এখানে পাকবাহিনী আর ওদের দালালেরা ক্যাম্প বসিয়েছে, এটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। গ্রামের মানুষদের ধরে এনে এখানে অত্যাচার করা হয়। আর গ্রামের মাতব্বর রাজাকার জোরপূর্বক সাধারণ গরিব গ্রামবাসীদের গরু, ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে ঐ ক্যাম্প পাঠিয়ে দেয় ক্যাম্পের কমান্ডারের সম্মতির জন্যে। এই ক্যাম্পে ছাগল পৌছে দেওয়ার কাজ নিয়ে মতলব মিলিটারি ক্যাম্পের সঙ্গে জড়িত হয়। এখানে ওর একটা কাজ জুটে যায়। কমান্ডারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। অপরদিকে ডাক্তার সাহেবকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে এ ক্যাম্পে ধরে এনে অত্যাচার করা হয়। ভাগ্য গুণে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তবে তার দায়িত্ব পড়ে প্রতিদিন একবার করে ক্যাম্পে হাজিরা দেওয়ার। এ সময় ডাক্তার পরিকল্পনা করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অভিযানের। মতলব পাক কমান্ডারকে গলফ খেলার বড়ো মাঠে নিয়ে যায়। পাকবাহিনীর একটা গোটা ব্যাটেলিয়ন ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই পথে এলে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কিশোর মতলব কমান্ডারকে এই পথে নিয়ে আসে। নিজের মৃত্যু দিয়ে এই কিশোর নিজের গ্রাম আর দেশকে শত্রুমুক্ত করার মহান কর্তব্য পালন করে গেছে।

'আমরা তোমাদের ভুলবো না'র সংগঠনে রয়েছে- প্রযোজনা- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- হারুনুর রশিদ; কাহিনি- সরদার জয়েনউদ্দিন; চিত্রগ্রাহক- পঙ্কজ পালিত; সংগীত- আবু তাহের; সম্পাদনা- জালাল আহমেদ; অভিনয়- আরিফুল হক, আবুল হায়াত, আশীষ কুমার লৌহ, বেগম মন্টু, সাজলী, রিপন, বাবুল, কালাম ও অন্যান্য। ছবিটি রঙিন এবং ১৬ মিলিমিটার ফিল্মে তৈরি। সাপ্তাহিক 'সিনেমা'য় এ ছবি সম্পর্কে লেখা হয়—

'সরদার জয়েনউদ্দিনের গল্প থেকে ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক নিজে। যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। একান্তরের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর স্মৃতি যেন অনুভূতিতে নাড়া দেয়। আমরা তোমাদের ভুলবো না'র সবচেয়ে বড়ো দিক হচ্ছে-এর বাস্তব নিষ্ঠুরতা। গ্রামের প্রতিরোধ, মিলিটারি ক্র্যাডাউন, যুদ্ধ সংগঠন, মিলিটারির অত্যাচার এবং যুদ্ধের দৃশ্যগুলো জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ছবিটির চিত্রগ্রাহক পঙ্কজ পালিতের গতিশীল চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়। ছবিতে একটা টেনশন তৈরি করে সম্পাদক সফল হয়েছেন।

মূল কথা হচ্ছে, হারুনুর রশিদ আন্তরিকতার সঙ্গে ছবিটি তৈরি করেছেন। এতে কোনো ভড়ং নেই। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণী ও শিশু-কিশোরদের কাছে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব কিছু ঘটনা তুলে ধরেছেন। গণতন্ত্রের বিজয়ের প্রাক্কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাসমৃদ্ধ, জীবনধর্মী চলচ্চিত্র ধারার নবজন্ম হবে এ মুহূর্তে আমরা এ আশাই করব। শিশু একাডেমিকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ হারুনুর রশিদের সং প্রয়াসকে। ছবিটি বেশি করে জনসমক্ষে প্রদর্শনের আহবান জানাই।

এরপর আরো কিছু শিশু-কিশোর উপযোগী চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। তবে তা সংখ্যায় কম। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যত বেশি শিশু-কিশোরতোষ চলচ্চিত্র নির্মিত হবে ততই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে ভালো। এর ফলে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দেশপ্রেম ও ইতিহাস চেতনা জাগবে। ■

লেখক পরিচিতি: চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষক



বাইরে শীতের মনমরা বিকেল। সন্ধ্যা এখনও নামেনি। বিকেলটাও ফুরিয়ে যায়নি, এ সময়টা খুব মনোরম। ব্যালকনির ঝিল ধরে টুপুর তাকিয়ে থাকে। দাদু বলেছেন, এ সময়টাকে গোধূলি বলে, বুঝিয়ে দিয়েছেন— রাখাল গরু নিয়ে মাঠে চড়াতে যায়। বিকেল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি এ সময়টাতে গরু নিয়ে ফিরে আসে।

টুপুর প্রশ্ন করেছে, ঠিক আছে দাদু, বুঝলাম গরু চড়িয়ে রাখাল ফিরে আসে— গোধূলি নামটা কেন হলো বললে না তো! এই তো বলছি সবুর করো। বিনায়ক দাদু বলেন, গরুর পায়ের ধুলো বাতাসে উড়তে থাকে। গরুর অন্য নাম গো, তার সঙ্গে ধূলি মিলে গোধূলি হয়ে গেল। টুপুর খুব খুশি, হাততালি দিয়ে ওঠে।

আজ নতুন শব্দ শেখা হলো। গরু মানে গো তা তো সে জানতই না। তাছাড়া এ সময়টাকে গোধূলি বলে তাও জানা ছিল না ওর। কি মিষ্টি শব্দ। বন্ধুদের বলতে হবে ফোন করে। দাদুর মুখে শোনার পর থেকে এ সময়টাকে ভালোবেসে ফেলে টুপুর। গোধূলি গোধূলি আহ্ দারুণ। দাদু মানুষটি তার সবচেয়ে প্রিয়। ঠিক যেন এক কম্পিউটার। সব জানে এই মানুষটি। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মা ডাকছে।

টুপুর এই টুপুর কোথায় গেলিরে।

নীপা পড়ার টেবিলে হরলিঙ্গের পেয়লা নামিয়ে রাখে। হরলিঙ্গ আর বিস্কিট খেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে বসে।

হ্যাঁ পড়তে বসবে সে, দেদার হোমওয়ার্ক আছে। তবে তার আগে দাদুর কানে কানে একটি কথা বলে আসতে হবে।

ছুটে গিয়ে দাদুর কানে কানে ফিসফিস করে বলে, মনে আছে দাদু কাল কিম্ব ফ্যান্টাসি কিংডম যাব।

দারুণ খুশি এখন টুপুর। বাংলা, ইংরেজি হোমওয়ার্ক করতে হবে না। অঙ্ক কষতে হবে না। করোনার জন্য রোজই ছুটি তবে বাইরে যেতেও মানা। ওর কানের কাছে রিনরিন করে বাজতে থাকে ছুটি ছুটি ছুটি। ক্যালেন্ডারের পাতায় লাল রঙে লেখা তারিখটি জ্বলজ্বল করে। ছুটির দিনে টুপুর আর টুসকি ফ্যান্টাসি কিংডম যাবে।

দাদুকে নিয়ে ওদের গর্বের শেষ নেই। অন্যরকম এক মানুষ। খুব ছিমছাম তিনি। ইন্ড্রি করা শার্ট প্যান্ট পরেন। সকাল বিকেল নিয়ম করে রমনা পার্কে হাঁটতে যান। হাতে থাকে রূপো বাঁধানো লাঠি। এখন অবশ্য করোনার জন্য বাইরে যান না। কোনো ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভর করেন না দাদু। কখনও টুপুর হাত ধরে সাহায্য করতে গেলে বলে উঠেন— আমি এত বুড়িয়ে যাইনি রে। ডাক্ত হেঞ্জ মি।

বিনায়ক দাদু কলেজে বাংলা পড়াতে, এখন রিটায়ার্ড করেছেন। দাদুকে ভাই-বোন দুজনেই খুব পছন্দ করে, ভালোও বাসে। বৈশাখি মেলায় কে নিয়ে যাবে আমাদের? কেন দাদুই তো আছে। শিশুপার্কে আমরা কার সাথে যাব মা? কেন, তোমার দাদুর

সাথে, এখন অবশ্য ওরা আর বাইরে যায় না, স্কুলও ছুটি। ফ্যান্টাসি কিংডমে গেলে মুখে মাস্ক পরে যাবে। সারাটা দিন ওরা বাড়িতেই সময় কাটায়, এমনটা কি ভালো লাগে?

টুপুর আর টুসকি পড়তে বসল না। স্কুল ছুটি, পড়তে বসতে হবে কেন? কাল তো সবারই ছুটি। ভাই-বোন মিলে কার্টুন দেখতে বসে। বিনায়ক এসে বলেন, কেউ আজ পড়তে বসলে না, কেন বলো তো? ছুটি নিয়ে শুধু মেতে আছো। কালকে কীসের ছুটি বলো। দুজনে একসাথে বলে, বিজয় দিবসের ছুটি।

সে তো বুঝলাম, এ দিনটিতে আনন্দ মিশে আছে সত্যি, দুঃখও কিম্ব কম নয়। তোমরা তো জানো মুক্তিযুদ্ধের কথা। এই জিনিসটাই দাদু ভাইয়ের খুব বিচ্ছিরি। সব ব্যাপারে গম্ভীর গলায় উপদেশ দেওয়া। এ দিনটি আর দশটা ছুটির দিনের মতো নয়, কেমন তাহলে? টুপুর ভাবে, দাদু কি ঘুম থেকে উঠে কাল সকালে বলবে আর্থারাইটিসের ব্যাথাটা জব্বর বেড়েছে দাদুভাই। হাঁটতেই তো পারছি না। বানচাল হবে না তো কালকের যাওয়া? কতদিন হলো বাইরেও যায় না, দুষ্ট করোনার জন্য। টুসকি রিন রিনে সুরে বলে, কালকের যাওয়াটা তো আমাদের ঠিক দাদু। হাতে হাত রেখে প্রমিস করো। হা হা করে হাসতে হাসতে দাদু নাতি-নাতির হাতে হাত মেলান।

তার মানে প্রোগ্রামটি ঠিক আছে। নীপাও ভাবে অনেক দিন বাইরে যায় না, মুখে মাস্ক পরে ঘুরে আসবে। উত্তরা থেকে তো কাছেই। বাচ্চা দুটি মনমরা হয়ে থাকে সারাক্ষণ। আজ একটু দেরিতে উঠেছে টুপুর, তবে এখন রোজই ছুটি। ডিসেম্বর মাস। এ সময় শীত তো পড়বেই। তবে এখনও জাকিয়ে পড়েনি। শীত, নরম কাঁথা গায়ে দিয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে। ব্যালকনিতে রাখা টবের পাতাবাহারে দু-চারটে চড়ুই লাফালাফি করছে। একটানা কিচিরমিচির করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে ওর।

স্কুল খোলা থাকলে ছয়টার দিকে বিছানা ছাড়তে হতো। ইঞ্জি করা ড্রেস পরে, টাই পরে, একেবারে সাহেব বনে যায় ও। মাখন মাখা পাউরুটি, ডিম পনিরের টুকরো মুখে গুঁজে, ঢকঢক করে কমলার জুস দিয়ে সব খাবার পেটে চালান করে দিত। এখন ঝামেলা চুকেবুকে গেছে। সকালবেলা সময়েরও যেন পাখনা গজায়। বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে বলতে থাকেন, হারি আপ টুপুর, জলদি করো।

আজকের ছুটির সকাল তাই তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে টুপুর। বিনায়ক দাদু বলেন, রিল্যাক্স করো। মোবাইলে দাদু কার সাথে যেন কথা বলছেন, তার কথা যেন আর ফুরোতেই চায় না, তা হতেই পারে, দাদুর বন্ধুবান্ধবের সীমা নেই।

কান পেতে কিছুই শোনে না সে। পরের কথা শুনতে হয় না— মা শিখিয়েছেন। তার ভাবতেও ভালো লাগছে দুপুরে খাবারের পর একটু ঘুম, তারপর দাদুর সাথে বেরিয়ে পড়া। কত দিন পর বাইরে ঘুরতে যাবে ইস- দুপুরটা ঝট করে ফুরিয়ে যেতে থাকে। নীপা বলল, যাও এবারে শুয়ে পড়। অনেক লাফালাফি ঝাঁপঝাঁপ হয়েছে। যাও বিছানায় যাও টুসকি। বাবা বললেন, আজ দেখছি শীত জাকিয়ে বসেছে। শালটা দাও। টুপুর ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখতে থাকে দাদুর হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলছে। ঘুম ভেঙে যেতেই জানালা দিয়ে দেখে কমলালেবু রং বিকল।

খাট থেকে নামতে নামতে ডাকে, দাদু, দাদু ও দাদুভাই। নীপা মৃদু গলায় ধমক দেয়।

ঘাড়ের মতো চ্যাচাচ্ছিস কেন? বা রে প্রোগ্রাম করে রেখেছি দাদুর সাথে ফ্যান্টাসি কিংডমে যাব। কী করে যাবি রে? দাদু তো দরকারি কাজে বেরিয়ে গেছে। দাদু বেরিয়ে গেছে? এমন অবাক করা কথা কোনোদিন যেন শোনেনি টুপুর। দাদুর সাথে কথা বলেই তো প্রোগ্রাম ঠিক করেছে। দাদু অমন করল কেন?

মা ওর মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে বলেন, মন খারাপ করে না সোনা, কই টুসকি তো মন খারাপ করছে না। টুসকির মন খারাপ? তবেই হয়েছে। শিশুপার্ক, মিরপুরের চিড়িয়াখানা সবই ওর কাছে সমান। ঘুরে না বেড়ালেই বা কি। এক পিস কেক, পুডিং কিংবা মুড়িমাখা পেলেই হলো। খাবার পেলে টুসকি আর কিছু চায় না। টুপুর তো আর টুসকি নয়, খুব মন খারাপ হয়েছে ওর। দাদুর ওপর রাগ আর অভিমান জমতে থাকে বুকের ভেতর। না দেখা কোভিড-১৯ এর ওপর ভীষণ রাগ হয়। কোথেকে এলি তুই? বাবার কাছে গিয়ে বলে, জানো পাপা, দাদু হলো লায়ার। খুব মিথ্যে কথা বলে দাদু।

বাবা বললেন, এমন করে বলে না টুপুর। তার হয়ত জরুরি কাজ পড়ে গেছে। বাবার নরম কথাতেও রাগ পড়ে না, আর কখনো সে দাদুর সাথে কথা বলবে না। দাদু ওর বেস্ট ফ্রেন্ড মোটেও নয়। রাত সাড়ে আটটায়

ফিরেন দাদু। কাপড়চোপড় ছেড়ে শাল গায়ে চড়িয়ে ডাইনিং স্পেসের দিকে যেতে যেতে ডাকেন, কোথায় রে টুসকি? টুপুর কোথায়? খেতে এসো। আমি খাব না, তোমার সাথেও আর কথা বলব না। মিষ্টি করে বিনায়ক বলেন, আমার অপরাধ? কিছুতেই দাদুর সাথে নাতির ভাব হয় না। দাদু বিছানা থেকে টেনে এনে চেয়ারে বসান টুপুরকে। শোনো দাদুভাই একতরফা বিচার করলে তো হয় না। কেন আমি হঠাৎ করে বেরিয়ে গেলাম। কেন প্রমিস করেও তোমাকে আর টুসকিকে নিয়ে ফ্যান্টাসি কিংডমে যেতে পারিনি তা শুনবে তো। গম্ভীর স্বরে টুপুর বলে, বলো। দাদু আবেগ মাখা সুরে বলতে থাকেন, আজ ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস, তাই তো? খুব জানি। এ দিনটি কিন্তু হঠাৎ করে আসেনি। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত থেকে শুরু হয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, হামিদ আর টিক্কা খানের প্র্যান্ মাফিক অপারেশন শুরু হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান মানে আমাদের দেশকে ওরা একেবারে শেষ করে দেবে। তোমাকে তো কিছু কিছু বলেছি দাদুভাই। হ্যাঁ বলো, শুনছি। আমি তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। সিলেটে গিয়েছি মা-বাবাকে দেখতে। টুসকি অবাক হয়ে বলে, দাদুভাই তোমারও মা-বাবা ছিল? বিনায়ক জোরে হেসে ওঠে। বলেন, নাহ গো দিদি ভাই, খালি তোমাদেরই মা-বাবা আছে। বউমা, বিমল শুনে যাও তোমার মেয়ের কথা।

এই টুসকি থামবি। দাদু গল্পটা বলে। মা-বাবা সবাই এসে বসেছেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে সব সময়ই ভালো লাগে। হ্যাঁ শোনো, সিলেট শহরে যাতে পাকিস্তানি মিলিটারি ঢুকতে না পারে তার জন্য আমাদের বয়সি যারা, ব্যারিকেড দেওয়ার চেষ্টা করছি। কেন দাদু পাকিস্তানি মিলিটারি যাতে শহরে ঢুকতে না পারে এজন্য তো?

বাহ্ আমাদের টুপুর তো অনেক বুদ্ধি রাখে। ইউ আর রাইট। ওরা ঢুকতে পারলেই তো বাঙালিদের মারবে। নীপা বলে, এবার ব্যারিকেডের গল্পটা বলুন বাবা। হ্যাঁ শোনো, সবাই বলছে তাড়াতাড়ি করে মিলিটারি আসার রাস্তা বন্ধ করতে হবে। খুনির দল এসে যাচ্ছে, জলদি করো। কী দিয়ে ব্যারিকেড দেবো আমরা। ইউ, পাটকেল, গাছপালা, ছোটো ছোটো ডাল, ড্রাম যা পাচ্ছি তা দিয়ে বাধা দেবার প্র্যান্ করছি। ব্যারিকেড দিলে ওদের অপারেশনে অসুবিধা

হবে। শোনো পাকিস্তানি জল্লাদরা কি করল জানো? শোনার কৌতূহলে চিকচিক করছে টুপুরের দু'চোখ। সবাই ব্যারিকেড নিয়ে ব্যস্ত। আমরা চার বন্ধু কাজল, মকবুল, রায়হান, টিটো সবাই কাজ করছি। এরই ফাঁকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ওরা— এসে গেল। চেষ্টা করে বলতে থাকে ওরা—কাহা হ্যায় বে কমবখত মুক্তি? ইধার আযা। হিম্মত হ্যায় তো আ যা সামনে।

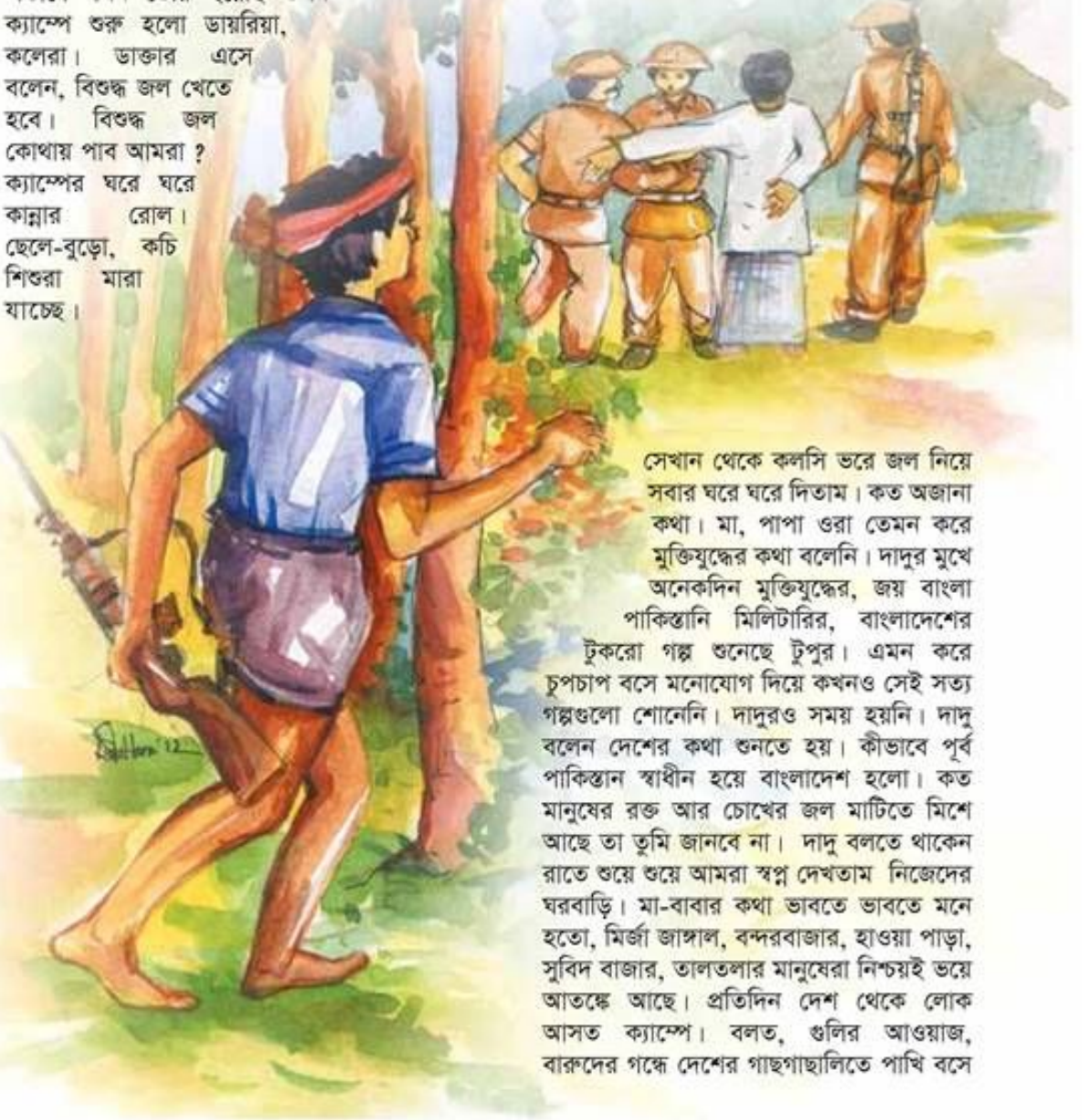
দাড়িয়াপাড়ার কলেজ পড়ুয়া ছেলে তামিম বাধা দিতে গিয়ে নিজেই ব্যারিকেড হয়ে গেল। মারা গেল? হ্যাঁ দিদি ভাই, ওদের গুলিতে মারা পড়ল ছেলেটা। তোমরাও মার খেলে? কী করব তাহলে, আমাদের খালি হাত, ওদের হাতে অস্ত্র। শুরু হলো সিলেট শহরে ওদের অত্যাচার। সব শহরেই হয়েছে। আমি সিলেটে ছিলাম তো তাই সেই শহরের কথাই বলছি। জয় বাংলা শুনলেই ওরা খোপে ওঠে পাগলের মতো চ্যাচায়।

কিধার হ্যায় মুক্তি? কমবখত কি বাচ্ছে, আ যা সামনে। রাত দুটো- তিনটের সময় বাড়িতে বাড়িতে মর্টার ফেলত। আমাদের বাসার ছাদ মর্টারে পুড়ে গেয়েছিল। মর্টার কী দাদু ভাই? গোলা বোমা ছুড়ে মারার যন্ত্র। তারপর শোনো, এসব অত্যাচার তো চূপ করে হজম করা যায় না। অমল নামে এক বন্ধু বলল, চল আমরা পালিয়ে যাই। সেই একাত্তরে মানুষ পালিয়ে গিয়ে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা আর মেঘালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ঠিক করলাম আমরাও যাব। তোমার দিদা আর দাদুর কথা একটুও ভাবিনি। সবার ওপরে দেশ। পাঁচ বন্ধু মিলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উঠলাম বালাট ক্যাম্পে। বালাট ক্যাম্প কোথায় দাদু? সুনামগঞ্জ শহরে দাঁড়িয়ে দেখা যায় নীল কাচের মতো ও ঝকঝকে খাসিয়া পাহাড়, সেখানে ছিল বালাট ক্যাম্প, পানছাড়া ক্যাম্প। মিলিটারিদের অত্যাচারে যে যেখানে পেরেছে পালিয়ে গেছে। আমরা শরণার্থী হয়ে বালাট ক্যাম্পে উঠলাম। টুপুর জানতে চায়, শরণার্থী মানে কী দাদু? রিফিউজি। এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে যারা আশ্রয় নেয় তাদেরকে শরণার্থী বলে। তারপর শোনো, ক্যাম্পে আমরা রান্নার জন্য সসপ্যান পেলাম, কিছু চাল-ডালও সাহায্য পেলাম। ব্যাস কোনোরকমে পাঁচ বন্ধু মিলে খিচুড়ি রান্না করি, খাই, ঘুমাই। অন্য সময় যুদ্ধে যাবার ট্রেনিং নিই। নীপা বলে, আমার তখন জন্মই হয়নি। তোমার পাপারও জন্ম হয়নি। উনিশ'শ একাত্তর সালের কথা, এক নয় সাত এক বুঝতে

পেরেছ? বিনায়ক বলতে থাকেন, ক্যাম্প থেকে বের হয়ে বালির বস্তা নিয়ে হাঁটি, এক্সারসাইজ করে শরীরটাকে মজবুত করি।

পাঁচ বন্ধু মিলে মনে যেন সারাক্ষণ প্রতিজ্ঞা করি পাক সেনাদের মারতে হবে। দেশকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর যুদ্ধ করতে গেলে তোমরা? আমরা কোন সেক্টরে গিয়ে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ব, এভাবে যখন তৈরি হয়েছি তখন ক্যাম্পে শুরু হলো ডায়রিয়া, কলেরা। ডাক্তার এসে বলেন, বিসুদ্ধ জল খেতে হবে। বিসুদ্ধ জল কোথায় পাব আমরা? ক্যাম্পের ঘরে ঘরে কান্নার রোল। ছেলে-বুড়ো, কচি শিশুরা মারা যাচ্ছে।

একান্তরের সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনও শিউরে উঠি। নীপা জিজ্ঞেস করে, জল তাহলে কোথেকে আনতেন বাবা? বালাট ক্যাম্পের একটু দূরে ছিল ঝোরা। ঝোরা কী দাদু? ফাউন্টেন? তার মানে তো ঝরনা। না না দাদু সেটা ঝরনা ছিল না, শিলিং-এ বিডন বিশপ ফলস দেখেছ, সে রকম নয় টুপুর। সেখানকার পাহাড়ে অল্প জলের যে ধারা বয়ে গেছে সেটাই ঝোরা। একেবারে টলটলে জল।



সেখান থেকে কলসি ভরে জল নিয়ে সবার ঘরে ঘরে দিতাম। কত অজানা কথা। মা, পাপা ওরা তেমন করে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেনি। দাদুর মুখে অনেকদিন মুক্তিযুদ্ধের, জয় বাংলা পাকিস্তানি মিলিটারির, বাংলাদেশের টুকরো গল্প শুনেছে টুপুর। এমন করে চুপচাপ বসে মনোযোগ দিয়ে কখনও সেই সত্য গল্পগুলো শোনেনি। দাদুরও সময় হয়নি। দাদু বলেন দেশের কথা শুনেতে হয়। কীভাবে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হলো। কত মানুষের রক্ত আর চোখের জল মাটিতে মিশে আছে তা তুমি জানবে না। দাদু বলতে থাকেন রাতে শুয়ে শুয়ে আমরা স্বপ্ন দেখতাম নিজেদের ঘরবাড়ি। মা-বাবার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হতো, মির্জা জাদ্দাল, বন্দরবাজার, হাওয়া পাড়া, সুবিদ বাজার, তালতলার মানুষেরা নিশ্চয়ই ভয়ে আতঙ্কে আছে। প্রতিদিন দেশ থেকে লোক আসত ক্যাম্পে। বলত, গুলির আওয়াজ, বারুদের গন্ধে দেশের গাছগাছালিতে পাখি বসে



গান গায় না। রাতের বেলা কুকুর করুণ সুরে কাঁদে। ছোটো বাচ্চারা ভয়ে কাঁদতেও ভুলে গেছে।

পাকিস্তানি মিলিটারিরা খুব আনন্দ পেত। বলত-দেখ কিতনা ডর গ্যায়া, কুন্ডা ভি ডর ডরকে রোতেহে। আভি ফুলে নেহি খিলতে, চিড়িয়া ভি গানা বান্দ কার দিয়া। তুম লোক ভি জয় বাংলা বোলনা ছোড় দোও ক্যায়া? নেহি ছোড়ে গা? কমবখত কাঁহিকা, তো মউতই হোগা।

টুপুরের সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারপর? তারপর আর কি। অনেক দুঃখকষ্টের পর দেশ স্বাধীন হলো। আজকের দিনটি আমাদের বিজয় দিবস। ১৬ই ডিসেম্বর। সে তো তুমি জানোই টুপুর। হ্যাঁ দাদু, দুঃখের অনেক গল্প বললে, কিন্তু ফ্যান্টাসি কিংডমে কেন নিয়ে গেলে না সে কথা তো বললে না। হ্যাঁ এবার বলব। শেষ দুপুরে আমার বন্ধু রায়হানের ফোন এসেছিল। বালাট ক্যাম্পে আমরা একসাথে ছিলাম। চলো আগে খেয়ে নেই। ডাকছে। শীতের রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। টুপুর বলে, খাবার পর কিন্তু গল্পটা শেষ করতে হবে। করোনা ভাইরাসের ভয়ে সারাক্ষণ সবাই ভয়ে ভয়ে থাকে। সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোও, দু-হাতে স্যানিটাইজার মাখো। অনেকদিন পর আজকের এই সুন্দর রাতটি এসেছে। সবাই ঘুমিয়ে গেছে। হিম পড়ছে বাইরে। জেগে আছে শুধু বিনায়ক আর টুপুর। বিনায়ক বললেন, ওখানে গিয়ে জানলাম দাদু কাজল মারা গেছে। মকবুল, রাজীব, টিটোও এসেছিল। রায়হান বাড়িতেও তো এখন হাঁটাচলা করতে পারে না। পায়ে স্প্রিন্টার লেগেছিল। জানিস দাদু ভাই আজ বিজয় দিবসে সবাই মিলে পুরনো দিনের স্মৃতির কথা বললাম। টুপুর অপলক চেয়ে আছে দাদুর মুখের দিকে। জানিস টুপুর, অনেক দিন পর সবাই মিলে গাইলাম, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। দাদুর শিরা ভেসে থাকা হাতটি চেপে ধরে টুপুর। নীরব এই হিমেল রাতে মন কেমন করা গল্প শুনতে শুনতে দাদু নাতির কখন যেন ভাব হয়ে গেছে। বিনায়ক বলেন, আজ ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসে বেড়াতে না গিয়ে রায়হানের বাড়িতে গিয়ে কি ভুল করেছি দাদু ভাই? মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা দাদুর

মুখটি কী জ্বলজ্বল করছে। সারা মুখে কি স্নিগ্ধতার আলো। কী জবাব দেবে সে দাদুকে?

আমি কেন আর দশটি ছুটির দিনের সাথে বিজয় দিবসের ছুটিকে গুলিয়ে ফেললাম? কী হয় এদিনে শিশুপার্ক কিংবা ফ্যান্টাসি কিংডমে না গেলে। কী হয় টিভিতে কার্টুন ফিল্ম না দেখলে? সবার আগে দেশকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। মোমবাতির ফোটার মতো আবেগে আর কান্নায় গলে যেতে থাকে টুপুর। না না, মাথা নাড়ে সে। নট অ্যাট অল দাদু। তুমি ভুল করোনি মোটেও। ইউ আর রাইট। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাদু আর তার বন্ধুদের নাম কেউ কোনোদিনও জানবে না। কেউ ওদের সংবর্ধনা দেবে না। তবু শীতের এই চাঁদের আলো ভরা রাতে বীর মুক্তিযোদ্ধা বিনায়ক দাদুকে জড়িয়ে ধরে টুপুর। ফ্যান্টাসি কিংডম কিংবা নন্দন পার্কে গিয়ে বাম্পার কার, জু জু ট্রেন-এ না চড়লে কি হয়। ইগলু হাউজ আর ইজি ডিজির জন্য একটুও মন খারাপ হয় না ওর, বরং কাছে থেকে মুক্তিযোদ্ধাকে দেখার আনন্দে সে বিভোর। বলে, দাদু তোমরাই আসল মুক্তিযোদ্ধা। পুরো বালাট ক্যাম্পকে তোমরা সার্ভিস দিয়েছ। ছোট টুপুর একটি রাতেই যেন অনেক বড়ো হয়ে গেল। এখন সব বুঝতে পারে ও। দাদু ওকে টুকরো টুকরো মুক্তিযুদ্ধের সত্যি গল্প বলে, বিজয় দিনের কথা বলে, অনেক বুকিয়ে দিয়েছেন। ফ্যান্টাসি কিংডম যাবার দিন নয়, জম্পশ করে খাবার দিন নয় এটি। এ দিনটি সব দিনের চেয়ে আলাদা, একেবারেই অন্য রকম। দাদুর গলা খুব সুরেলা গুনগুন করে গাইছেন-

ও আমার দেশের মাটি

তোমার পরে ঠেকাই মাথা...

এই মুহূর্তে দাদুকে বড়ো মাপের একজন মানুষ বলে মনে হয়। এত কাছের মানুষ তবু কত দূরের।

দাদুর বুকে মুখ লুকিয়ে টুপুর বলে, তুমি আর তোমার বন্ধুরা অবাক করা মানুষ। তাই নাকি রে? হ্যাঁ দাদু। সবাইকে দেখতে পারিনি কিন্তু তোমাকে তো রোজ দেখি। তুমি ওয়াডারম্যান। ইউ আর মাই হিরো। দাদু আর নাতি দুজনের চোখ কান্নায় ভিজে যেতে থাকে। দেশকে ভালোবাসলে অকারণেই কান্না ঝরে। দাদু কোমল স্বরে বলেন, কাঁদছিস দাদু ভাই? ঘরে ঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে করে সবাই কাঁদুক তোর মতো। বাইরে বালাট ক্যাম্পের আনন্দ-বেদনার হাজারো স্মৃতি নিয়ে চাঁদমাখা রাত বয়ে যেতে থাকে। ■

লেখক পরিচিতি: শিশু সাহিত্যিক ও গীতিকার

গল্প

## তিনকন্যা

মনি হায়দার

বলুর হাতে অনেক কাজ। পুতুল  
বানানো এখনো হয়নি। মাথা বানানো  
শেষ, কিন্তু মুখ, চোখ, নাক বানাতে  
হবে না? না বানাতে পুতুল কি  
জীবিত হবে? হবে না।

ও বলু? আবার ডাকে মীরা।

ডান চোখের শেড দিতে  
দিতে তাকায় বলু- কী  
অইচে? চিন্তাস কে?

আমি অহন যাই? গলায়  
আকুতি মীরার।

পুতুল রেখে মীরার হাত ধরে  
বলু বলে- তুই চইলা গেলে  
বিয়া শাদি কেমনে অইব, ক?  
কত কাম পইড়া রইছে। মেহমান কে  
কে আইবে তারও লিস্টি অইল না। আর  
কী কী রানতে অইব - তারও কোনো কতা  
অইল না। আবার বিয়া শাদির মেহমানরা রান্দা  
ভালো না অইলে কত বদনাম করে।

এহন আমি যাই। কাইল আইয়া বাকি কাম কইরা দিমু।

আর একটু খাইকা যা।

এহন না গেলে মায় বকব। সন্ধ্যা অইছে না?

হয়, মীরারে অহনই যাইতে দে। দেহস না আন্ধার  
অইয়া আইচে-মীরাকে সমর্থন জানায় রিয়ানা।  
আমাগো বাড়ির পর বড়ো রাস্তা। রাস্তার পাশে বিরাট  
একখান কোলা। হেই কোলার পর ঝোড়ের খাল।  
খালের পর অইলো অগো বাড়ি। দেরি অইলে মীরা  
একলা যাইবে কেমনে? ভয় পাইব না? হেরপর ছনছি

সন্ধ্যাকালে একটা মুরগি ধরা খাটাস বাইর অয়  
কয়েক দিন ধইরা।

তাইলে যা, বলু একটু ভয়ই পায়। কিন্তু কাইল  
আইসা পরিস।

হাসে মীরা, যাই। কাইল সকালে আসমু- উঠোন  
ছেড়ে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করে মীরা।

এই খারা, রিয়ানা হাত ধরে বুলুর, ল মীরারে বড়ো রাস্তায় আগাইয়া দিয়া আহি।

ল- হাসে বুলু।

বুলু, রিয়ানা আর মীরা একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করে বড়ো রাস্তার দিকে। বুলু আর রিয়ানাদের একই বাড়ি। ওরা দুজনে চাচাতো বোন। পাশাপাশি দুটি ঘর। মীরাদের বাড়ি একটু দূরে, ভেতরে। তিনজন পড়ে আমঝুপি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস খ্রিতে। তিনজনের মধ্যে খুব ভাব। যখন তখন এ বাড়ি ও বাড়ি করে ওরা। মীরার বাবা দেওয়ান ওমর ঢাকায় চাকরি করে। বাড়ি আসার সময়ে দেওয়ান ওমর নিজের মেয়ে মীরার জন্য যা আনে, বুলু আর রিয়ানার জন্যও আনে। ওদের জন্য না আনলে মীরা পরে না। ছোটো চাকরি দেওয়ান ওমরের। টাকাপয়সাও তেমন পায় না। তবুও মেয়ের আনন্দের জন্য সে তিনজনের জন্যই জামাকাপড় আনে। আবার জামাকাপড় আনলেই চলবে না, সব কটা হতে হবে এক রঙের, এক ডিজাইনের। মাঝে মধ্যে একসঙ্গে তিনজনের একই ডিজাইন মেলাতে পারে না। তবুও আনে। কষ্ট হলেও দেওয়ানের ভালো লাগে- তার আনা জামাকাপড় পরে আমঝুপি গ্রামের তিনটে মিষ্টি মেয়ে একসঙ্গে হাঁটে, গল্প করে, হেসে খেলে বেড়ায়। দেখতে কী যে ভালো লাগে। একই পোশাকে তিন-তিনটি মেয়েকে দেখে গ্রামের অন্যরাও খুব মজা পায়। গ্রামের মানুষেরাও জেনে গেছে- তিনকন্যার গল্প।

বুলুর বাবা নেসার উদ্দিন হাল চাষ করে। তার মেয়েকে ঢাকা থেকে জামাকাপড় এনে দেয় দেওয়ান, খুবই সুখ পায় নেসার উদ্দিন। দেওয়ান বাড়ি এলে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে একবেলা খাওয়ায়। সঙ্গে থাকে তিনকন্যা। সেদিনটি খুব আমোদে আর উল্লাসে কাটে। অন্যদিকে রিয়ানার বাবা অসুস্থ। বিছানায় পড়ে থাকে সারা বছর। হিমাংগ কবিরাজের চিকিৎসা চলছে। কবিরাজ বলছে- সান্নিকপাতিক জ্বর। দিনে-রাতে আধময়লা বিছনায় শুয়ে খুক খুক করে কাশে কাশেম উদ্দিন। তার দুই ছেলে কচা নদীতে মাছ ধরে সংসার চালায়। কাশেম উদ্দিন দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারে না দেওয়ানকে। কিন্তু প্রাণ খুলে দোয়া করে।

বড়ো রাস্তায় যেতে যেতে ছোটো রাস্তায় দেখা বুলুর বাবা নাসির উদ্দিনের সঙ্গে। সে মাঠ থেকে ঘরে ফিরছে ছাই রঙের দুধের গরু 'অবলা' আর 'অবলা'র বাছুর 'টেপা'কে নিয়ে। 'অবলা'কে খুব চেনে মীরা। বুলুদের বাড়ির উঠোনে কাফুলা গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকে অবলা। অবলাকে আদর করে মীরা। বসে বসে 'টেপার' গলার ফুলে আদর করে। 'টেপা' ঝিম মেয়ে আদর উপভোগ করে। প্রায়ই কাকা ওদের বাড়িতে বাটি ভরে দুধ পাঠায়। দুধ খেতে খুব পছন্দ করে মীরা। সাদা দুধ-দুধের মতো এমন রং কোথাও নাই।

তিনকন্যাকে দেখে থমকে দাঁড়ায় কাকা- তোমরা এই ভর সন্ধ্যায় কই যাও?

বাজান, মীরা বাড়ি যাইতেছে। অরে একটু বড়ো রাস্তায় দিয়া আহি।

তাড়াতাড়ি যাও। সন্ধ্যা অইয়া আইচে- এই অবলা, হট হট। নাসির উদ্দিন অবলা আর টেপাকে সামলাতে সামলাতে চলে যায়। তিনকন্যা বড়ো রাস্তায় ওঠে।

পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে ঘরে ফিরছে। গ্রামের আরো কয়েকজন গরু-বাছুর নিয়ে ফিরছে। বুলুদের পাশের বাড়ির রমিজ ওদের দেখলে হাসে আর প্রশ্ন করে- তিন মাইয়ায় কই যায়? শ্বশুরবাড়ি?

একেক দিন একেক জনে উত্তর দেয়। আজকের পালা রিয়ানার। রিয়ানা জবাব দেয়- হয় যামু। তোমার বাড়ি দাওয়াত খামু। রিয়ানার যুতসই জবাবে খুশি মীরা আর বুলু। রমিজ গরু সামলাতে সামলাতে ক্যাবলাকাস্তের মতো দাঁত বের করে হাসে-

ওরে মোর আন্টা-রে ভয় পাওয়ার ভান করে রমিজ গরু নিয়ে চলে যায়।

বাজানরে কইয়া অরে একদিন মাইর খাওয়াইতে অইবে- বুলু মন্তব্য করে।

বাদ দে তো- মীরার গলায় উৎকণ্ঠা, আমি যাই। বলতে বলতে বড়ো রাস্তা পার হয়ে ওদের পারে চলে আসে। অন্য পারে দাঁড়িয়ে বুলু আর রিয়ানা। তিনজন তাকিয়ে আছে তিনজনার দিকে। কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে হামিদ মুয়াজ্জিনের আজান। আজানের সুর শেষ হতে না হতেই দূরে রাখালের বাঁশির সুর ভেসে আসছে। ওরা জানে, বাঁশি বাজায় মনোজ চাচা। মানুষটা সকাল-বিকাল বাঁশি বাজায়।

কাইল আসার সময়ে তোর ছেলে পুতুলের জামার কাপড় লইয়া আসিস- রিয়ানা বলে মীরাকে।

কেমনে আনমু? মীরা বলে- আমাগো বাড়িতে বাড়তি কাপড় নাই।

হেইয়া কইলে ক্যামনে অইবে? হাসে বুলু, আমার মাইয়ার লগে পোলার বিয়া দিবা কি কাপড় ছাড়া? মাইনষে হোনলে কইবে কী? তিনজনে হাসে।

ফোড়ন কাটে রিয়ানা, তহন তোরে সবাই কইবে কাপড় ছাড়া জামাইর মা।

ধ্যাৎ! দেহি মায়রে কইয়া- মীরা এক দৌড়ে বড়ো রাস্তা থেকে ছোটো রাস্তায় চুকে পড়ে। বুলু আর রিয়ানাও একে অপরের হাত ধরে চুকে পরে বাড়ির দিকের রাস্তায়।

গভীর রাত। ঘুমিয়ে আছে মায়ের বুকের কাছে মীরা। স্বপন দেখছে-ঈদের আগের দিন বাবা দেওয়ান ওমর এসেছে ঢাকা থেকে। ওর জন্য নিয়ে এসেছে লাল রঙের জামা, পাজামা আর জুতো। এনেছে মাথার

চুলের ফিতা আর পায়ের জন্য আলতা। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে মীরা। কাছে আসে দেওয়ান- কীরে মা, তোর পছন্দ অয় নাই?

পছন্দ অইচে, মাথা নাড়ে মীরা।

তাইলে মুখ গোমড়া কইরা আছো কেন?

হাসে মীরার মা ছফেলা বেগম- আপনে অর লাইগা আনছেন জামাকাপড় আর বুলু আর রিয়ানার লাইগা আনেন নাই কিছু?

এবার হাসে দেওয়ান- আনছি গো আনছি। আমি তো জানি আমার মাইয়া কীসে খুশি অইবে! বলতে বলতে দেওয়ান আর একটা ব্যাগ খুলে রিয়ানা আর বুলুর জন্য আনা একই রং আর ডিজাইনের জামাকাপড় বের করে। চিলের মতো হৌঁ মেরে নিজের হাতে নেয় মীরা জামাকাপড়গুলো। হাতে নিয়ে নাচতে থাকে। দেওয়ান ওমর আর ছফেলা বেগম মেয়ের উচ্ছাস দেখে চোখ ভরে।

মা আমি যাই- দরজার দিকে ছোটো মীরা।



কোথায় যাও? চিৎকার করে জানতে চায় দেওয়ান।

বলুগো বাড়ি।

তাড়াছড়ো করে যেতে যেতে দরজার বাতায় বাড়ি লাগে মাথার। মীরা মাথা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে— মাগো! আর ঠিক তখনই ছফেলা বেগম মেয়েকে দু-হাতে আকড়ে ধরে ভয়ানক কণ্ঠে ডাকে— মীরা? মীরা?

ব্যথা পাওয়া মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে চোখ মেলে মীরা— কী মা?

শিগগিরি ওঠ।

কী অইছে মা?

মনে হয় মিলিটারি আইচে।

মিলিটারি!

মনে পড়ে বাবাজানের মুখে শোনা কথা। এই তো মাসখানেক আগে বাড়ি এসেছিল দেওয়ান। বলেছিল— পাকিস্তানিগো মতিগতি ভালো না মা। যে-কোনো সময়ে যুদ্ধ শুরু অইতে পারে। ওরা বাঙালিগো আতে ক্ষমতা দেবে না। আর বাপের বেটা এ্যাকখান শেখ মুজিবুর।

শেখ মুজিবুর কেডায় বাজান?

হাসে দেওয়ান— হে অইলো আমগো মানে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নেতা। যেমন লম্বা তেমন চওড়া বুক। এক্কেবারে রাজপুত্রের নাহান লাগে দেখতে।

তোমার কাছে হের ছবি নাই?

ঢাকায় আছে। আবার আসার সময়ে লইয়া আমু।

তুমি হেরে চেনো?

হেরে কেডায় না চেনে? বুঝলা—এইবার পাঞ্জাবিগো হেও ছাড়বে না।

দূর থেকে আসছে মানুষের চিৎকার, আর্তনাদ, গুলির ভয়ংকর শব্দ ঠা টা ঠা টা ঠাস ঠাস। সঙ্গে মানুষের হইচই আর হইচই। এতসব শব্দের সঙ্গে গরুর ভয়ানক হান্না হান্না চিৎকারও ভেসে আসছে। ছোটো ঘরটা আঙনের আলোয় হেসে উঠছে।

মা? এত আলো কেন?

আলো না মা আঙন।

কীয়ের আঙন?

মারে পাকিস্তানি মিলিটারি মানুষের ঘরে আঙন দিতাছে।

কেন? ঘরে আঙন দিতাছে কেন?

ল তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে ল। মিলিটারি এদিকেও আইতে পারে। অগো কোনো বিশ্বাস নাই।

এত রাইতে কই যামু?

না গেলে আঙনে পুইড়া মরমু? মেয়ের হাত ধরে টান দেয় ছফেলা বেগম— দেরি করিস ক্যান? নাম তাড়াতাড়ি। জঙ্গলে যাইয়া পলামু।

ছফেলা বেগমের কথায় এবং টানে মীরা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামে। হাই তোলে। দরজার বাইরে আসে। দিগ্বিদিক ছুটেছে অজস্র অজস্র মানুষ। চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে। বুক চাপড়তে চাপড়তে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। ঘর পোড়ার আঙনে পুরো আমবুপি গ্রাম ঝলসে উঠছে। ঘরের লেলিহান আঙনে সবকিছু প্রায় দেখা যায়। মনে হচ্ছে আকাশের সূর্য নেমে আসছে মাথার উপর। সেই ছুটে চলা মানুষদের সঙ্গে মুহূর্তে সামিল হয় ছফেলা আর মীরা। ছুটেছে ছুটেছে অনেক মানুষের সঙ্গে ঢোকে গ্রামের জঙ্গলে। গ্রামের গভীর জঙ্গলও ঘর পোড়ার দাউ দাউ আঙনের শিখায় প্রায় পরিষ্কার। কোথায় লুকাবে আমবুপি গ্রামের মানুষ? মাটির নিচে? গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কচানদীর তলে? নারী শিশু-বৃদ্ধদের সঙ্গে বিরাট একটা জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে মীরা আর মীরার মা ছফেলা বেগম। মীরা ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে ভাবছে— বাজানে কেমন আছে?

রাতের ভয়ংকর সময় কেটে ভোর এসেছে।

আজকে আর আমবুপি গ্রামের মসজিদে আজান হয়নি। মসজিদের হামিদ মুয়াজ্জিনকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে তার লাশটা মসজিদের সামনে ফেলে রেখেছে। মসজিদেও আঙন লাগিয়েছে। গাছপালার পাখিরাও ডাকল না। কেবল সূর্য উঠায় আমবুপির মানুষেরা বুঝল সকাল হয়েছে। গোলাগুলির শব্দ অনেক আগেই থেমে গেছে। দু-একজন করতে করতে আমবুপি গ্রামের মানুষের চলাচল আবার শুরু হয়েছে। পাশের বাড়ির খালেক মাস্টার জঙ্গলে এসে জানিয়েছে— পাকিস্তানি মিলিটারিরা চলে গেছে। যাওয়ার আগে রাস্তার পাশে যত বাড়িঘর ছিল সব বাড়িতে আঙন দিয়েছে। আর মানুষ মেরেছে পাখির মতো গুলি করে। সারা রাস্তায়

মনে পড়ে বাবাজানের মুখে শোনা কথা। এই তো মাসখানেক আগে বাড়ি এসেছিল দেওয়ান। বলেছিল- পাকিস্তানিগো মতিগতি ভালো না মা। যে-কোনো সময়ে যুদ্ধ শুরু অইতে পারে। ওরা বাঙালিগো আতে ক্ষমতা দেবে না। আর বাপের বেটা এ্যাকখান শেখ মুজিবুর।

শেখ মুজিবুর কেডায় বাজান?

হাসে দেওয়ান- হে অইলো আমগো মানে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নেতা। যেমন লম্বা তেমন চওড়া বুক। এক্কেবারে রাজপুত্রের নাহান লাগে দেখতে।

মানুষের লাশ আর লাশ.....চাইয়া দেখা যায় না। অরা মানুষ না, পশু, একটা পশু। এমন করেও মানুষ মারে? খালেক মাস্টার হায় হায় করতে করতে চলে যায়।

মা?

মেয়ের ভয়র্ত কণ্ঠে অবাক ছফেলা বেগম- কী অইচে?

মিলিটারিরা কী বুলু আর রিয়ানাগো বাড়িতে আঙন দিছে? অরা কী বাইচা আছে? ছফেলার কোল য়েসে মাটির উপর বসেছিল মীরা। এক ঝটকায় দাঁড়ায় সে। আমাগো পুতুলগুলোর কী অইচে?

কই যাও?

আইতেছি ... দৌড় শুরু করে মীরা। গ্রামের আঁকাবাঁকা পিচ্ছিল ঘাস মোড়ানো পথ দিয়ে ছুটতে থাকে হরিণের মতো। ছুটতে ছুটতে মীরা দেখতে

পায়- পথের উপর কিংবা পাশে মানুষের মাথার খুলি, অর্ধেক হাত, দুই তিনটি মাথা, অর্ধেক পোড়া গরু এখনও মাটিতে পরে আর্তনাদ করছে, পোড়া বাড়িঘরে এখনো আঙন জ্বলছে, সেই সব ঘরের সামনে বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছে নারী-পুরুষ আর শিশুরা। এক রাতের পর আমবুপি গ্রামের এই ভয়ংকর ছবি দেখে মীরা দিশেহারা। দৌড়ায় আর ভাবে- এ কোথায় এলাম? এইডা কী আমগো গেরাম? এই গেরামে কী আমরা এক লগে ঘুরে বেড়াইতাম? ক্যান ওরা আমাগো গেরামডারে এমন করল?

মীরা বড়ো রাস্তা পার হয়ে ঢোকে বুলুদের বাড়ির ছোটো রাস্তায়। মিনিট খানেক দৌড়েই থমকে দাঁড়ায় মীরা-এই বাড়িতে পাশাপাশি দুটো বাড়ি ছিল, কাল সন্ধ্যায় এই বাড়ির উঠানে আমগাছের নিচে বসে পুতুল পুতুল খেলেছে তিনকন্যা- মীরা, বুলু আর রিয়ানা বিশ্বাস করা কঠিন। দুটি ঘরই পুড়ে ছাই। ছাইয়ের মাঝখান থেকে উড়ছে অতৃপ্ত ধোঁয়া, কোথাও মুঠো মুঠো আঙন আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। বাড়ির কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন নেই।

মীরা দু-হাতে মুখ ঢেকে হাট্ট মুড়ে বসে পোড়া দুটি ঘরের সামনে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে ঘর পোড়া ছাইয়ের ভেতর থেকে এখনই ছুটে আসবে রিয়ানা আর বুলু। বুলু হাসতে হাসতে বলবে- তোর লগে মজা করছিলাম রে...। আমার মাইয়ার লগে তোর পোলার বিয়া অইলে তুই তো আমার বেয়াইন। তোর লগে একটু মশকরাও করতে পারুম না।

কিন্তু ... না বুলু আর রিয়ানাকে কোনোদিন আমবুপি গ্রামের মানুষেরা দেখেনি। মীরা, বুলু আর রিয়ানা নামের তিনকন্যাকে পরির মতো, আলোর মতো, পাখির মতো, দুধের সরের মতো-একসঙ্গে দেখতে পায়নি একই রঙের পোশাকে, একই ডিজাইনের জামায় আমবুপি গ্রামের মানুষেরা। ■

লেখক পরিচিতি: কথা সাহিত্যিক

## বীরপ্রতীকের বীরত্ব

মিয়াজান কবীর



উত্তাল পদ্মা পাড়ের এক ডানপিটে ছেলে। নাম তার মাহফুজুর রহমান খান। পদ্মার মতোই দুরন্ত দুর্বীর ছিলেন মাহফুজ। বাংলা মায়ের দামাল এই ছেলেটি দেখতে ছিলেন শ্যামল বরণ। শরীরের গড়ন ছিল হালকা-পাতলা ছিপছিপে। মায়ের মুখখানি তার সবার মন কেড়ে নিত। তার চপল-চঞ্চলতায় সারা গ্রাম মেতে উঠত। খেলার সাথীদের নিয়ে কখনো খেলাধুলায় আবার কখনো দুষ্টমির ছলে বনবাদাড়ে ঘুরেফিরে বেড়াতে মাহফুজ।

মাহফুজুর রহমান খানের জন্ম ১৯৪৯ সালের ঢাকার দোহার উপজেলার শাইনপুকুর গ্রামে। বাবার নাম জিয়াউর রহমান খান, মায়ের নাম ফিরোজা খানম। মা-বাবার চার মেয়ে এক ছেলের মধ্যে মাহফুজ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন বলেই সবার চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন মাহফুজ। মাহফুজের লেখাপড়ার হাতেখড়ি শাইনপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাহফুজ এই স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপনী শেষে বাঘরা হাই স্কুলে ভর্তি হন। মাহফুজ যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন তার বাবা মারা যান। মাহফুজের মানিরূপায় হয়ে ছোটো ছোটো সন্তানদের নিয়ে তার বাবার বাড়ি মানিকগঞ্জের পিপুলিয়া গ্রামে চলে আসেন। বাবার মৃত্যুর পর মাহফুজ অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। মাহফুজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে

তার চাচাত ভাই ডা. মেজর এ আর খান (আবদুর রহমান খান, পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) তিনি ১৯৬৮ সালে মাহফুজকে ঢাকায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তারপর তাকে শহীদ রমিজ উদ্দিন হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। মাহফুজের খেলাধুলার প্রতি ছিল প্রবল ঝোঁক। সহপাঠীদের নিয়ে খেলায় মেতে থাকতেন তিনি। লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন। অনেক চেষ্টা করেও মাহফুজকে লেখাপড়ায় তার ভাই মনোযোগী না করতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েন এ আর খান। তিনি মাহফুজের ভবিষ্যত জীবনের কথা চিন্তা করে গাজীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কারিগরি বিভাগে টেকনিশিয়ান পদে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯শে মার্চ জয়দেবপুরের মুক্তিকামী সংগ্রামী মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই সময় মাহফুজ চাকরিস্থল থেকে চলে আসেন মানিকগঞ্জে। মুক্তিযুদ্ধের দুই নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপটেন আব্দুল হালিম চৌধুরী। তিনি সম্পর্কে ছিলেন মাহফুজের মামা। তার কাছে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধে। মায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন মাহফুজ। তাই প্রথম দিকে তার মা মুক্তিযুদ্ধে যেতে বারণ

করেছিলেন। মাহফুজ তার মাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'মা, মানুষ মরণশীল, আমি তো ঘরে থেকেও মরে যেতে পারি।' মাহফুজের এমন কথা শুনে তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই আমার আঁধার ঘরের বাতি। তোকে হারালে আমি কী নিয়ে বাঁচব? মাহফুজরও সেদিন মায়ের গলা জড়িয়ে কেঁদেছিলেন। মাহফুজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মায়ের আদর-স্নেহ, বোনের মমতা, সাথীদের ভালোবাসা সবকিছুকে উপেক্ষা করে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু মাহফুজ সুযোগ পেলেই গোপনে মাকে দেখতে আসতেন।

মাহফুজের এক সহযোদ্ধা নাম তার শাহ আলম। তিনিও ছিলেন বাবা- মায়ের একমাত্র সন্তান। সম্মুখ সমরে শত্রুর গুলিতে নিহত হন এই সহযোদ্ধা। তখন ছিল বর্ষাকাল। সারা এলাকা ছিল জলমগ্ন। বর্ষার প্রাবনে নিমজ্জিত হবার দরুণ তাকে দাফন করার মতো কোনো জায়গা ছিল না। আবার যেসব এলাকা কিছুটা উঁচু ছিল সেসব এলাকার মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ দাফন করার জায়গা দিতে দ্বিধাঘৃণে ভুগতে থাকে। নিরুপায় হয়ে মাহফুজ সহযোদ্ধার লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে দাফনের জন্য ঘুরেফিরে রাতের আঁধারে। যে বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য তাঁর নিজের সুন্দর জীবনকে উৎসর্গ করলেন, সেই দেশ প্রেমিক শহীদের লাশ দেশের মাটিতে সাড়ে তিন হাত জায়গায় ঠাই হলো না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে মাহফুজ তার সহযোদ্ধার লাশ ভাসিয়ে দেন অধৈর্য নদীর স্রোতধারায়।

মাহফুজ সহযোদ্ধার করুণ পরিণতিতে বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। বিষণ্ণতায় মনে পড়ে তার মায়ের কথা। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে রাতের আঁধারে ফিরে যান বাড়িতে। শহিদ সহযোদ্ধার মাগফেরাত কামনায় নিজ বাড়িতে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করেন। তারপর ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময় মাহফুজ সহযোদ্ধার রক্তমাখা কাপড় মায়ের হাতে দিয়ে সযতনে রাখতে বলেন। দেশ স্বাধীন হলে রক্তমাখা কাপড় সহযোদ্ধা শহিদ শাহ আলমের মায়ের কাছে ফেরত দিবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। একথা শুনে মাহফুজের মা আবেগে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, বাবা, তুমি যদি যুদ্ধে শহিদ হও, তোমার লাশটি যেন আমি দেখতে পাই। মায়ের এমন আবেগতড়িত কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে



বীরপ্রতীক মাহফুজর রহমান খান  
[বাঁ দিক থেকে প্রথম]

নীরবে-নিঃশব্দে বেদনাভরা মন নিয়ে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান মাহফুজ।

মানিকগঞ্জের একটি গ্রাম হরিণা। পদ্মা পাড়ের এই হরিণাতে সার্কেল অফিসারের অফিস গড়ে উঠেছিল। এই সার্কেল অফিসে ছিল পাক বাহিনীর ক্যাম্প। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এখানে রয়েছে ওয়্যারলেস সেট। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে পাকিস্তানি বাহিনী পুনরায় ক্যাম্প গড়ে তুলতে পারে। একথা চিন্তা করে ওয়্যারলেস সেট ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করে মুক্তিযোদ্ধারা। এই পরিকল্পনা অনুসারে ওয়্যারলেস অফিসের ভেতরে পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হয়। মাহফুজ দরজা খুলে ওয়্যারলেস অফিসে ঢুকে পড়েন। ঢুকেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মাহফুজের সারা শরীরে আগুন ধরে যায়। মাহফুজ বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে পাশের ডোবায় বাঁপ দেন। এ সংবাদ পেয়ে ডা. চিত্তরঞ্জন দত্ত এসে তাকে চিকিৎসা করেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই মাহফুজ সুস্থ হননি। কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মা, বোন, আত্মীয়স্বজন, সহযোদ্ধাদের কাঁদিয়ে মাহফুজ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শাইনপুকুরের মাটিতে শ্যামল ছায়ায় চিরন্দিয়ায় শায়িত হয়েছেন। স্বাধীনতার পর তিনি বীরত্বের জন্য বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তার কবরের ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে কবিতা মঞ্জুরি :

'একান্তরে মুক্তিযুদ্ধে বিলিয়ে দিয়ে প্রাণ,  
চিরন্দিয়ায় শায়িত শহিদ মাহফুজর রহমান।' ■

লেখক পরিচিতি: গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও গবেষক





## স্বাধীনতা দীপ্ত অহংকার

মুহাম্মদ ইসমাঈল

স্বাধীনতা সবুজ-শ্যামল মাঠের ফসল  
স্বাধীনতা মাতৃজেনেড়ে আধো আধো বোল  
স্বাধীনতা বাগিচার রঙিন প্রজাপতি  
স্বাধীনতা সবার অবাধ চলার গতি ।

স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধার আত্মহতীর ফল,  
স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শক্তি-সাহস বল  
স্বাধীনতা সস্তা দামে না কেনা কোনো পণ্য  
স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়া অধিকার আদায়ের জন্য ।

স্বাধীনতা ফুল কাননের সদ্য ফোটা ফুল,  
স্বাধীনতা পেয়ে আজি ধন্য জাতি কুল ।  
স্বাধীনতা বর্ষ ঘুরে আসে বারংবার  
স্বাধীনতা সোনার বাংলার দীপ্ত অহংকার ।

## বঙ্গবন্ধু

মো. সাখাওয়াত তালুকদার

মাতৃভূমি স্বদেশ পেতে  
রয়েছে যার অবদান  
তিনি হলেন সবার প্রিয়  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

তার ডাকে সারা দিয়ে  
বাঙালি পেয়েছিল স্বাধীন একটি দেশ  
বঙ্গবন্ধুই নামটি রাখলেন  
দেশের নামটি বাংলাদেশ ।

যতদিন থাকবে বাংলা ও বাঙালি  
ততদিন হবে একটি প্রিয় নাম  
তিনিই আমাদের জাতির পিতা  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

## স্বাধীনতা তুমি

মো. হাসু কবির

স্বাধীনতা তুমি,  
তিরিশ লক্ষ দেশ দরদি  
শহিদ ভাইয়ের প্রাণ  
স্বজনহারা বিয়োগ ব্যথা  
বিরহের সুর, গান ।

স্বাধীনতা তুমি,  
রক্তে ভেজা খণ্ড ভূমি  
সবুজ-শ্যামল দেশ  
স্বপ্ন আশা ধ্যানধারণা  
মনে সুখের রেশ ।

স্বাধীনতা তুমি,  
দীপ্ত সাহস সব হৃদয়ে  
গায়ের তেজি বল  
সংগ্রাম করে আদায় করা  
আকাঙ্ক্ষিত ফল ।

স্বাধীনতা তুমি,  
লাল-সবুজে মিশে থাকা  
একটি পতাকা  
রক্ত দিয়ে এই বাংলাদেশ  
হৃদয়ে আঁকা ।

## লাল-সবুজের পতাকায়

আহমেদ শামীম

লাল-সবুজের পতাকাতে  
আঁকা স্বাধীনতা,  
তিরিশ লক্ষ বীর শহিদে  
স্বপ্নটারই কথা।

সেনা ক্যাম্পে মা-বোনেদের  
দুঃখের কত স্মৃতি,  
এই বাঙালির মনে জাগায়  
ঐক্য গড়ার প্রীতি।

নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে  
বীরের বেশে ফেরা,  
পাকিসেনার হার মানাটা  
ইতিহাসে সেরা।

কিষাণ মাঝি জেলে তাঁতি  
সবার হৃদয় মাঝে  
পতাকাটা উড়ছে যেন  
সকাল-বিকাল-সাঁঝে।

## মায়ের ছেলে

অজিত রায় ভজন

যুদ্ধে যাব বিজয় পাব  
করছি সবে পণ,  
স্বাধীন দেশে গর্বে হেসে  
কাটবে সারাক্ষণ।

পড়ল সাড়া গ্রাম ও পাড়া  
বাংলা জাগে অই,  
এবার তবে আয়রে সবে  
যুদ্ধে शामिल হই।  
মায়ের ছেলে সবটা ফেলে  
অস্ত্র হাতে নেয়,  
যুদ্ধে চলে 'জয় মা' বলে  
স্লোগান মুখে দেয়।  
নয়মাস শেষে সূর্য হেসে  
আলোক দিয়ে কয়,  
বাংলাদেশে বীরের বেশে  
আসল প্রিয় জয়।

## সোনার স্বদেশ গড়তে

সুমন বনিক

দেশের জন্যে যুদ্ধে গিয়ে  
শহিদ হলেন যারা,  
তাঁদের আঁকা ছিল  
স্বাধীনতার ধারা।

লক্ষ প্রাণের রক্তে ভেজা  
আমার দেশের মাটি  
শহিদেদের গেলেন বলে  
দেশের প্রেমই খাঁটি।

রক্ত নদী বয়ে গেল  
পলাশ-শিমুল বনে,  
আজও সে দাগ লেগে আছে  
বাংলা মায়ের মনে।

যুদ্ধে পাওয়া দেশটা আমার  
এগোয় বাধা ঠেলে,  
সোনার স্বদেশ গড়তে সবাই  
দাও রে দরদ ঢেলে।



## ঐতিহাসিক ভাষণের সুবর্ণ জয়ন্তী

মো. ইকবাল হোসেন

বাঙালির ইতিহাসে অনেকগুলো দিন আছে, যা আমাদের মনে রাখতে হবে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ দিয়েছেন। সভা হবে ৩.০০টায় কিন্তু এর আগেই পুরো রেসকোর্স জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আরোহণ করেন বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে। সূর্য তখনো মাথার ওপর। মঞ্চে উঠে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়েন। উল্লাসে, স্লোগানে ফেটে পড়ল জনতা। তাঁর গায়ে ছিল সাদা পাঞ্জাবির উপর কালো মুজিবকোট। পুরো রেসকোর্স ময়দান 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'-স্লোগানে মুখরিত। বঙ্গবন্ধু দরাজ গলায় ভাষণ শুরু করেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।'

লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামের মূলমন্ত্র।

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি বাংলা মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাছে ঝুলিয়ে দিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র-মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব। আজও আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।'

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সর্বশেষ দুটি বাক্য, যা পরবর্তী সময়ে বাঙালির স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিক নির্দেশনা ও প্রেরণার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব।'

এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালি জাতি। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল এবং বিশ্বে সর্বাধিকবার প্রচারিত ও শ্রবণকৃত ভাষণ। ■

লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক

## মার্চের দিন মোহাম্মদ ইলিয়াছ

ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস  
সতেরোই মার্চ জন্মদিন-  
সাতই মার্চের সেই ভাষণে  
বাংলা হলো লাল-রঙিন।  
যুদ্ধ শুরু এই মার্চে-  
মুক্তিবীর ঘোষণা শুনে  
বীর বাঙালি মা-বোনেরা  
জয়ের স্বপ্ন বুনে।  
অগ্নিবরা মার্চের বছর  
রক্তে বিজয় এল-  
মুক্তিসেনা তোমার ছায়ায়  
শক্তি-সাহস পেল।  
স্বাধীনতা আর জন্মদিন  
একই সুতোয় গাঁথা  
শত বছরের সেসব স্মৃতি  
এই হৃদয়ে পাতা।  
ইতিহাসের মার্চ মাস-  
শত্রু-পাকির সর্বোনাশ।



## আত্মত্যাগ মো. আবির হোসেন

স্বাধীনতা পেতে যারা  
দিয়ে গেল প্রাণ  
কোনো দিন ভুলব না  
তাদের অবদান।

অমর হয়ে থাকবে তাঁরা  
আমাদের মাঝে  
গবিত্ত তাঁদের জন্য  
স্মরণ করি সকাল-সাঁঝে।

৭ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, যাত্রাবাড়ি

## ধন্য সবাই ধন্য

### নুসরাত জাহান

আজ স্বাধীনতার আনন্দেতে তৃপ্তি আসে  
দুঃখ ভুলে মনটা যেন ঝপিক হাসে।

রক্তে কেনা এই তো আমার মায়ের দেশ  
এমন দেশে আমরা সবাই আছি বেশ।

মা ও বোনের অশ্রুভেজা স্মৃতি আঁকা  
এদেশ আমার ভালোবাসায় আছে মাখা।

মিষ্টি মাখা ফুলের হাসি  
যায় না ভোলা এমন দেশে মায়ের হাসি।

এই দেশেতে পাখি আছে, আছে নদীর ঢেউ  
গঞ্জে গাঁয়ে সন্ধ্যাবেলায় ডাকছে যেন কেউ।

কত মানুষ রক্ত দিল এই দেশেরই জন্য  
এমন দেশে জন্ম নিয়ে ধন্য সবাই ধন্য।



## জাতীয় শিশু দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে শিশু দিবস পালন করা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ নিজেদের মতো করে পালন করে জাতীয় শিশু দিবস। আন্তর্জাতিকভাবে অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ২০শে নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আর আন্তর্জাতিক শিশু দিবস পালিত হয় ১লা জুন। এর বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। বাংলাদেশেও সেরকম একটি বিশেষ দিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। জাতীয়ভাবে ১৭ই মার্চ দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্যই জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রীয় 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ই মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে তখনকার মন্ত্রিসভা। এরপর ১৯৯৭ সাল থেকে দিবসটি পালন করা হয় এবং এ দিনটিকে সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করা হয়।

১৭ই মার্চ দিনটিকে শিশু দিবস ঘোষণার কারণ হিসেবে জানা যায়— জাতির পিতা কখনো জন্মদিন পালন করতেন না। তবে তিনি শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর জন্মদিনটাতে তিনি শিশুদের সাথে কাটাতে পছন্দ করতেন। ওইদিন শিশুরা দলবেধে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে যেত। এসব বিষয় বিবেচনা করে তাঁর জন্মদিনটাতে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও শিশুদের নিয়ে নানা আয়োজনে পালন করা হয় দিবসটি। তবে এবারের দিবসটি পালনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে ১০ দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি। বেঁচে থাকলে আজ তাঁকে নিয়েই বাঙালি উদযাপন করত তাঁর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী এবং তার ঠিক নয় দিন পর, তাঁর হাত দিয়েই উড়ত স্বাধীন বাংলায় সুবর্ণ জয়ন্তীর পতাকা।

১০ দিনের এই অনুষ্ঠানমালার শেষ হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির দিনে। এই দুই উৎসব উদযাপনে বর্ণাঢ্য সব আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে রাষ্ট্রতে যোগ দেন প্রতিবেশী ৫ দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান। ১৭ই মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশুর হৃদয় হোক রঙিন।'

এ উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা সদরে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনাসভা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। এছাড়া দেশের সকল ধর্মীয়, প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। ■



প্রিয়তা মেহজাবিন, ১ম শ্রেণি, শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা



নিবন্ধ

## শিশুবন্ধু বঙ্গবন্ধু

ফারিহা হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আজীবন শিশুদের ভালোবাসতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনে জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দেবে শিশুরাই। তাই তাদেরকেই গড়ে তুলতে হবে আগামীর উপযোগী করে। যখন তিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি, একজন নেতা হয়ে উঠছেন কেবল, তখনও তিনি তাঁর পরিকল্পনায় শিশুবান্ধব সিদ্ধান্ত রাখতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর সহযোদ্ধারা। শিশুরা সৃজনশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক সেটি ছিল তাঁর প্রত্যাশা। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি যখন সবার বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তখনও তিনি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। শিশুদের যে-কোনো সমাবেশে গেলে বা শিশুরা গণভবনে তাঁর কাছে গেলে, তিনি শিশুর মতো তাদের সঙ্গে মিশে যেতেন।

এই বিবেচনায় ২০০৯ সাল থেকে তাঁর জন্মদিনের দিনটিকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। শিশুদের জন্য তাঁর দরজা ছিল অব্যাহত। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের জন্য কিছু করার আশ্রয় ছিল তাঁর প্রবল। সেজন্য তিনি

ভেবেছিলেন শিশুদের সুরক্ষায় পূর্ণাঙ্গ একটি আইন থাকা জরুরি। আর সেই পথ ধরেই ১৯৭৪ সালের ২২ শে জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) প্রণয়ন করা হয়। কারণ বঙ্গবন্ধু জানতেন শিশুদের সুরক্ষারিক হিসেবে তৈরি করতে পারলেই আগামী দিনে তিনি পাবেন একটি সং এবং সাহসী জাতি। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পরতে পরতেও এই সত্যতা মেলে।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালে কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘরসহ অন্যান্য সংগঠনের শিশুবন্ধুদের অনুষ্ঠান এবং সমাবেশে যেতেন আশ্রয় নিয়ে। শিশুদের মার্চপাস্ট, লাঠি খেলাতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁকে যারা দেখেছেন তারা বলেন, তিনি এত সহজে, এত শিশুদের সঙ্গে মিশে যেতেন যে, শিশুরা তাঁকে অন্যায়সে একান্ত আপন করে নিত। জানা যায়, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-বৃদ্ধ সবার কাছেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন মুজিব ভাই। এর ফলে বয়সের ব্যবধান ঘুচে যেত।

শিশু এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম এবং জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, খারাপ

কাজে লাগানো ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘড়ঘন্ত্রকারী ঘাতকরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা না করলে তিনি একটি উজ্জ্বল প্রজন্ম উপহার দিতেন বাংলাদেশকে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ পরিবারে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল, তাঁর ডাকনাম খোকা আর পুরো নাম শেখ মুজিবুর রহমান। এই খোকা আজীবন শিশুদের সাথে শিশুতোষ মন নিয়ে মেশার পাশাপাশি তাদের জন্য এনে দিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ যেখানে তারা শির উঁচু করে জীবনযাপন করবে। এটি সকলেই জানেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ছোটো-বড়ো সবার প্রিয়। কারণ তিনি সবাইকে ভালোবাসতেন। খুব সহজে সবাইকে আপন করে নিতেন। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল গভীর মমতা।

বিশেষ করে ছোটোদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। স্নেহ করতেন। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। শিশুদের সবকিছুকে সহজে বুঝতে পারতেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব দয়ালু। একদিন তিনি দেখলেন, একটি ছেলে ভীষণ গরিব, টাকার অভাবে ছাতা কিনতে পারে না, রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে, অমনি তাঁর ছাতাটা দিয়ে দিলেন। কিংবা টাকার অভাবে কোনো ছেলে বইপত্র কিনতে পারছে না, দিয়ে দিলেন নিজের বইপত্র। এমনকি একদিন নাকি এক ছেলেকে ছেঁড়া কাপড় পরে থাকতে দেখে নিজের গায়ের কাপড় খুলে দিয়েছিলেন তিনি। দেশ ও জনগণের কাজে বঙ্গবন্ধু যখন গ্রামগঞ্জে যেতেন, তখন চলার পথে শিশুদের দেখলে গাড়ি থামিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। খোঁজখবর নিতেন। দুস্থ ও গরিব শিশুদের দেখলে কাছে টানতেন। কখনো কখনো নিজের গাড়িতে উঠিয়ে অফিসে বা নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। এরপর কাপড়চোপড়সহ নানান উপহার দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাদের ঘরে পৌঁছে দিতেন।

শৈশব থেকেই তাঁর বড়ো হৃদয় এবং ছোটো-বড়ো সবার জন্য দরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের প্রতি দরদি হওয়ার কারণেই নিপীড়িত বাঙালিকে তিনি অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতে

পেরেছেন। পেরেছেন সচেতন ও সংগ্রামী করতে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সেনা প্রধান আয়ুব খান জোর করেই দেশের ক্ষমতা দখল করে নেন। শেখ মুজিবসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখেন। পাঁচ বছরের জন্য পুরো দেশে রাজনীতি বন্ধ করে দিলে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান তরুণদের এক যুগান্তকারী নির্দেশ দিয়ে গেলেন। বললেন, 'এই পাঁচ বছর তোমরা শিশু সংগঠন কচিকাঁচার মেলার মাধ্যমে কাজ করো। নিজেদের সচল রাখো।' আমরা জানি দেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিশু সংগঠনটি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের মাত্র দুই বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ৫ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যই তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধু জানতেন, কচিকাঁচার মেলা প্রগতিশীল একটি শিশু সংগঠন। শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা বিকাশে শিশুরা সেখানে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার প্রেরণা পাচ্ছে। শিশুরা দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৬৩ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান তখনো বঙ্গবন্ধু উপাধি পাননি, জাতির পিতাও হননি। তবে আওয়ামী লীগের বড়ো নেতা। সেই সময় তিনি শিশুদের টানে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে কচিকাঁচার মেলা আয়োজিত শিশু আনন্দমেলায় এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশে মনটাকে একটু হালকা করার জন্য এলাম।' ছোট্ট এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ১৯৭২ সালে একদিন কচিকাঁচার মেলার কিছু খুদে বন্ধু তাদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি নিয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন গণভবনে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিজের চোখে দেখে শিশুরা প্রায় তিনশ ছবি আঁকে। এর মধ্যে বাছাই করা ৭০টি ছবি রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই দেখান বঙ্গবন্ধুকে। ছবিগুলো বঙ্গবন্ধু রাশিয়া সফরের সময় সে দেশের শিশুদের জন্য নিয়ে যাবেন শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে।



বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হলেন খুদে শিল্পী বন্ধুদের কাছে পেয়ে। তিনি তাদের হাসিমুখে আদর করলেন। তিনি অগ্রহ ভরে বাচ্চাদের আঁকা ছবিগুলো দেখছিলেন আর মন খুলে ছবি ও ছবির আঁকিয়েদের প্রশংসা করছিলেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আমার দেশের শিশুরা এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে, এসব না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।' তিনি শিশুদের সঙ্গে সেদিন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটান এবং যত্নের সঙ্গে খাবার পরিবেশন করেন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর ঘর থেকে শিশুরা বেরিয়ে আসার সময় তিনি গভীর তৃপ্তি ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজকের কর্মব্যস্ত সারাটা দিনের মধ্যে এই একটুখানি সময়ের জন্য আমি শান্তি পেলাম।' তিনি এত সহজে, এত আন্তরিকভাবে শিশুদের সঙ্গে মিশে যেতেন যে, শিশুরাও তাঁকে খুব কম সময়ের মধ্যেই আপন করে নিত।'

১৯৭২ সালের শেষের দিকের কথা। একদিন সকালে বঙ্গবন্ধু হাঁটতে বেরিয়েছেন, যেমনটি রোজ বের হন। সঙ্গে বড়ো ছেলে শেখ কামাল। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু দেখলেন-একটি বাচ্চা ছেলে। তার কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝুলানো। ছেলেটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বঙ্গবন্ধু ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন কেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে? ছেলেটি জানালো তার পায়ের কী যেন ফুটেছে এজন্য ব্যথা করছে। বঙ্গবন্ধু ছেলেটির পায়ের জুতা খুলে দেখেন জুতার ভেতর লোহার সুচালো মাথা বের হয়ে আছে। যার খোঁচায় পা দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তখনই ছেলেটির চিকিৎসার জন্য তাঁর দেহরক্ষী পুলিশকে নির্দেশ দিলেন। শিশুদের প্রতি সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, খারাপ কাজে লাগানো ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরই। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন। অহিংসা দিয়ে, মানবপ্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সমাজে যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু নির্মাণ করে গেছেন তার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই। কোনো ভালো মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা বলে

থাকি, লোকটা শিশুর মতো সরল। শিশু শক্রমিত্র সবাইকে ভালোবাসে, সবাইকে বিশ্বাস করে। কখনো সে মানুষের ভালোবাসা পায়, আবার কখনো প্রতারণিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সাথে শিশুদের মিল এখানেই যে, তিনিও শক্রমিত্র সব মানুষকে ভালোবাসতেন এবং সবাইকে অকাতরে বিশ্বাস করেছেন। শিশুদের মতো তিনিও মাঝে মাঝে মানুষের দ্বারা প্রতারণিত হয়েছেন। তবুও তিনি শিশুর মতো মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রাসেল আক্বাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত। আক্বাকে মোটেই ছাড়তে চাইত না।' শেখ হাসিনা আরো লিখেছেন, 'রাসেলের সব থেকে আনন্দের দিন এল যেদিন আক্বা ফিরে এলেন। এক মুহূর্ত যেন আক্বাকে কাছ ছাড়া করতে চাইত না। সবসময় আক্বার পাশে ঘুরে বেড়াত। এটা চিরন্তন সত্য যে, শিশুরা সবসময় স্বপ্নের জগতে বাস করে, আর স্বপ্ন বাস করেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনেও। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তাঁর স্বপ্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের আপামর মানুষের মাঝে বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত করেছে মানুষকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, মেধা, জ্ঞান, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও শিক্ষা দিয়ে স্বপ্নকে জয় করেছেন। স্বপ্ন আর আদর্শ এবং বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন, সংগ্রাম মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাঁকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে বাঙালি জাতি পেল একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মানচিত্র, স্বাধীন ভূখণ্ড, স্বাধীন পতাকা। একজন মানুষের জীবন তখনই সফল হয় যখন তিনি তাঁর লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেন। এই অর্থে বঙ্গবন্ধুর জীবন সফল। আজকের এই দিনে শিশুদের প্রিয় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অপর শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। একই সাথে প্রত্যাশা আজকের শিশুরা আগামী দিনে সুনাগরিক হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করবে। ■

লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক

গল্প

## খোকার জন্মদিন রফিকুর রশীদ



সেইবার চৈত্র মাসের গোড়াতেই আকাশ কাঁপিয়ে ঝড় ওঠে। সে কী দারুণ ঝড়! সারাদিন গেল গনগনে রোদদুর। এদিকে বিকেল না গড়াতেই উদ্দাম ঝড়ের তাণ্ডব। এক লহমায় সব যেন দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চায়।

টানা দিনের বেলা। উঠোনের উত্তরে ছাতিমতলায় সারা বিকেল খোলাংকুচি খেলা করেছে দুই বোন ফাতেমা এবং আছিয়া। দুজনের দুটো ডাকনামও আছে। বেগম এবং ঠাভু। দাদি মাঝে মধ্যে ডাকে এই নামে। গ্রামে এ রকম নাম কতই পাওয়া যায়। টুঙ্গিপাড়ার এই শেখ বাড়িতেই কত রকম নামের ছেলে-মেয়ে আছে! তাদের সঙ্গেই ফাতেমা-আছিয়ার শতক রকম খেলা। খেলতে খেলতে বেলা পড়ে যায়, সন্ধ্যা নামে, তবু খেলা ভাঙতে ইচ্ছে হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় ঝড় উঠতেই ছাতিম গাছের ডাল

ভেঙে পড়ে একটু দূরে। বড়ো বড়ো পায়ে দাদি ছুটে এসে দুই নাতনিকে টানতে টানতে নিয়ে আসে ঘরের মধ্যে। মুখে গজরগজর করে ঝড় উঠছে, গাছের ডাল মাথায় পড়ছে, তবু হুঁশ হয় না তাদের!

ঝড় থেমে যাবার খানিক পরে আতুর ঘর থেকে ভেসে আসে শিশুকণ্ঠের ট্যা ধ্বনি। ফাতেমা এবং আছিয়া দুই বোনই গুনতে পায় সে চিৎকার। খুব ইচ্ছে করে আতুর ঘরে উঁকি দিতে। খুব জানতে ইচ্ছে করে এবার কে এল তাদের ঘরে! ভাই নাকি বোন? এ নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কিও হয়েছে। ফাতেমা বলছে আবারও বোন হবে, আছিয়া বলছে ভাই। এসব তর্ক পছন্দ করে না দাদি। ফাতেমাকে ধমকানি দেয়। আছিয়ার গালে টোকা দিয়ে বলে-তুই কেমন করে জানলি!

দাদির ভয়ে ঘর থেকে বেরোতে পারে না দুই বোন। শিশুকণ্ঠের কান্নাধ্বনি আবারও শোনার জন্যে কান খাঁড়া করে থাকে। এরই মধ্যে ভেসে আসে নানার কণ্ঠে আজানের ধ্বনি। দুজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না। হঠাৎ দাদি এসে দুই বোনকেই চমকে দেয়,

কী করছিস তোরা? তোদের যে ভাই এসেছে, দেখবি চল।

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! দুই বোন খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। আছিয়াকে কোলে তুলে নেয় দাদি। ফাতেমার হাত ধরে টানে-চল, খোকাকে দেখবি চল।

খোকা! দুজনেই চমকে ওঠে, তবে কি তাদের ভাইয়ের নাম খোকা!

দাদি আবার ডাকে,

কই, আয়!

আতুর ঘরের কাছে পৌঁছতেই কেমন এক অচেনা লজ্জায় পেয়ে বসে ফাতেমাকে। সে দাদির পেছনে চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আছিয়া সড়সড় করে নেমে পড়ে দাদির কোল থেকে। বোনের মুখের দিকে তাকায়। বোন তার পিঠে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে,

তুই যা।

দাদি তখন দুই বোনকেই ডাকে,

আয়, ভেতরে আয়। তোদের ভাইকে দেখবি না?

দেখবে না মানে! তারা তো দেখতেই চায়। কেমন হয়েছে তাদের ছোট্ট ভাইটি। কিন্তু প্রথমে তাদের দৃষ্টি চলে যায় মায়ের মুখের উপরে। মায়ের কাছে ভাই নেই। কাপড়ের ন্যাকড়ার মধ্যে সদ্যোজাত শিশুটিকে জড়িয়ে দু-হাতের

তালোর উপরে নিয়ে মায়ের মাথার কাছে বসে আছে নানি। তাদের দাদি বাড়ি আর নানি বাড়ি একেবারে কাছাকাছি। তারা চাচাত বোনও বটে। সারাদিন দুই

বাড়ির আসা-যাওয়া লেগেই আছে। নানিকে তো আজ সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে এ বাড়িতে। এখন

দিব্যি খোকাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু নানির চোখে পানি কেন?

খোকাকে এবার কোলে নেয় দাদি। ওইটুকু শিশু দাদি আর নানির মধ্যে কী যে তফাৎ বোঝে, আবার সে ট্যাঁ করে ওঠে। দাদি তখন তাড়া লাগায়,

দেখ, তোদের ভাইয়ের চেহারা দেখ।

শুধু দেখা নয়, ফাতেমা হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেয় ছোট্ট ভাইটির তুলতুলে গাল। সেই গালে তখনো লেগে আছে রক্তিম আভা। দাদি ধমকে ওঠে,

যা। এত রাতে আর কোলে নিতে হবে না। সকালে নিস। এখন যা।

ফাতেমা এবং আছিয়া এরপর আতুর ঘর থেকে নেমে আসে উঠোনে। ঝড়ের পর আকাশ থেকে মেঘ সরে গেছে অনেকটাই। চৈতি চাঁদের আলো এসে লুটোপুটি খাচ্ছে সারা বাড়িতে। দিনের আলোর চেয়ে এমন চাঁদনি রাতের আলো যে এতটাই মধুমাখা, সে কথা মোটেই জানা ছিল না দুই বোনের। ফাতেমা সহসা বলে বসে খোকার গায়ের রং জোছনার মতো ফরসা, তাই না ঠাভু?

ঠাভু, মানে আছিয়া, আছিয়া কোনো জবাব না দিয়ে ফিক করে হেসে ওঠে।

ফাতেমার মন ভরে না। সে বলে,

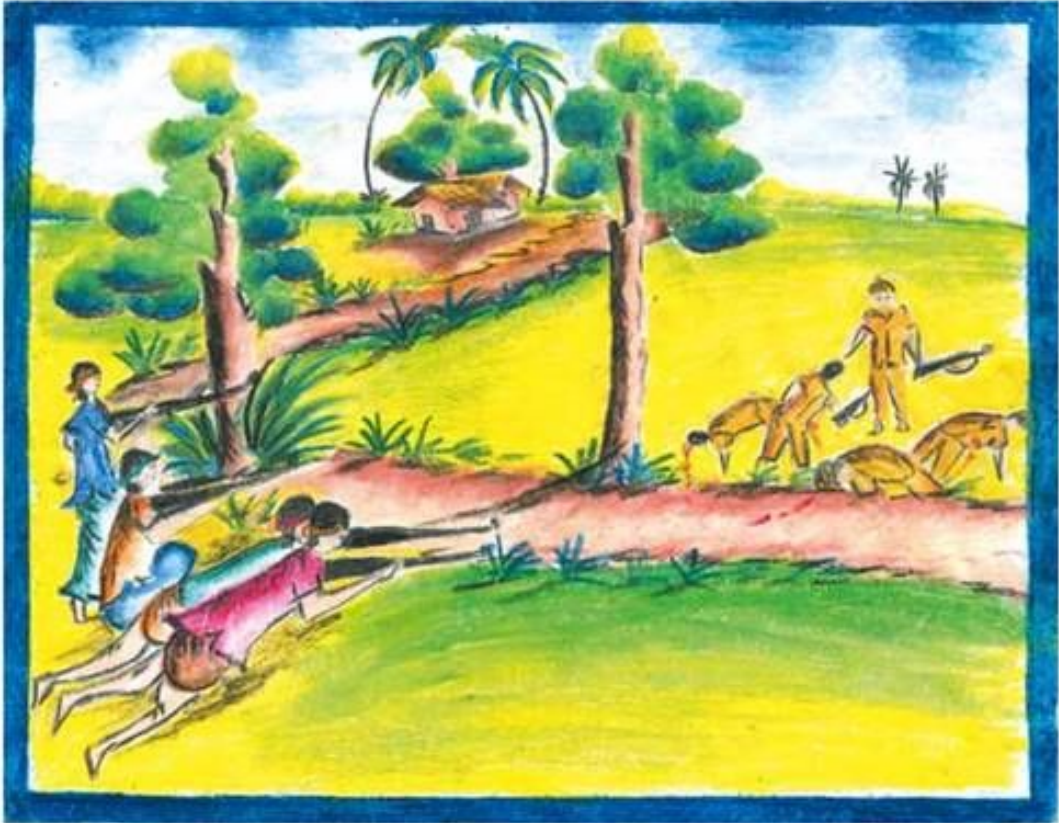
আক্বা দেখলে কী যে খুশি হবে!

ওদের আক্বা শেখ জুৎফুর রহমান সরকারি চাকরি করেন। আদালতের সেরেস্তাদার। ইচ্ছে করলেই যখন তখন বাড়ি আসতে পারেন না। আসতে আসতে সপ্তাহের শেষ দিন শনিবার। পুত্র সন্তান জন্মের খবর তিনি আগেই পেয়েছেন। শহর থেকে নানান পদের একরাশ মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরেন। সারা পাড়ায় সেই মিষ্টি বিলিয়ে দেন। খোকার মুখ দেখে আনন্দে তাঁর বুক ভরে যায়। দুই মেয়ের পর এই তাঁর প্রথম ছেলে। শেখ বংশে ছেলের সংখ্যা কম। তাঁর ঘরে খোকা এসেছে এক আকাশ আনন্দ নিয়ে। এ যে পরম সৌভাগ্য তাঁর। আইন আদালতের মানুষ

তিনি। কতদিন স্বপ্ন দেখেছেন পুত্র সন্তান হলে তাকে জজ-ব্যারিস্টার না হোক, অন্তত উকিল বানাবেন, মানুষের বিপদে আপদে সে পাশে দাঁড়াবে। না, উকিল হননি তিনি। তবে মানুষের পাশে ঠিকই দাঁড়িয়েছেন বন্ধু হয়ে। বড়ো হয়ে তিনি হয়েছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। বাঙালির জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনের আদুরে খোকার পূর্ণ নাম রাখেন তাঁর নানা শেখ আব্দুল মজিদ। পবিত্র কোরান থেকে মুজিব শব্দটি নির্বাচন করে তিনি প্রিয় নাতির নামকরণ করেন।

সবুজে সবুজ, শ্যামলে শ্যামল টুঙ্গিপাড়ার উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে ওঠার শক্তি, সাহস ও প্রেরণা তিনি লাভ করেন এই টুঙ্গিপাড়া থেকেই। এখানকার ফুল, পাখি, প্রজাপতি, নদী ও মানুষ তাঁর বুকের ভেতর যে ছবি এঁকে দেয়, বড়ো হয়ে তিনি সেটাকেই সারা দেশের ছবি বলে গণ্য করেন। ভালোবাসেন প্রিয় দেশ ও দেশের মানুষকে। দেশবাসী তাঁকে ভালোবেসে ডাকে বঙ্গবন্ধু বলে। তিনি সেই টুঙ্গিপাড়ার খোকা। ■

লেখক পরিচিতি: শিশু সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক



ঐশী দফাদার, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর কালীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা

নিবন্ধ

## খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু

জায়েদুল আলম



বাংলাদেশ—সবুজ শ্যামল গাছপালা, অসংখ্য নদীনালা, হাওর-বিল, সমুদ্র রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণিঝড়ের দেশ। বাংলাদেশ—বিভিন্ন কালের পরিবর্তনে প্রকৃতির নব নব সাজের ও রূপের দেশ। বাংলাদেশ—গানের দেশ, কবিতার দেশ, ছবির দেশ। বাংলাদেশ—বাংলা ভাষার দেশ বাঙালিদের দেশ—সোনার বাংলা।

এমন অপরূপ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের

১৭ই মার্চ এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার নাম শেখ লুৎফুর রহমান। মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তিনি পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। পিতা-মাতা আদর করে শেখ মুজিবকে ডাকতেন 'খোকা'। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম 'খোকা'।

গ্রামটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিখ্যাত মধুমতি নদী। এই নদীতে তখন স্টিমার চলত। সেই স্টিমারে করে তখন খুলনা হয়ে কলকাতা যাওয়া যেত। গোপালগঞ্জ তখন ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা শহর। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান গোপালগঞ্জ আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন।

ছেলেবেলা থেকে এই গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের মানুষদের বঙ্গবন্ধু চিনতে শুরু করেছিলেন। প্রকৃতির নানা পরিবর্তনে মানুষের কল্যাণে স্বাদেশিকতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। স্বদেশের মানুষকে ভালোবেসে দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। তাই বঙ্গবন্ধু সারাজীবন দেশের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। খোকা ছেলেবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতে যেমন শিখেছিলেন, তেমনি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন নিরলস সংগ্রামী। স্কুল থেকে ফেরার পথে তিনি শীতে কাঁপতে থাকা বৃদ্ধ মানুষকে নিজের গায়ের চাদর খুলে দিয়েছিলেন। বর্ষাকালে গরিব বন্ধুটি ভিজে স্কুলে এসেছিল দেখে নিজের ছাতাটি বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে এভাবেই বঙ্গবন্ধু নিজের মতো করে মানুষের অবস্থা বুঝতে শিখেছিলেন। ছেলেবেলায় বাবা চেয়েছিলেন শেখ মুজিবকে আইনজীবী করে গড়ে তুলতে। তিনি নিজে সরকারি চাকরে ছিলেন। বিদেশি সরকারের অধীনে চাকরি করতে গিয়ে গোলামি জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণায় তিনি দক্ষীভূত হচ্ছিলেন। বিবেকের দংশন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না বলেই পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে এ নতুন বাসনায় উদ্বুদ্ধ হন তিনি। ছেলেবেলায় মুজিব ছিলেন দুর্বল। শিশুকাল থেকেই পড়াশুনার হাতেখড়ি। এরপর স্কুলে যাবার পালা। ১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে তাঁকে বাড়ির পাশেই গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। ১৯২৯ সালে নয় বছর বয়সে তাঁকে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। ১৯৩৯ সালে পিতার চাকরির কারণে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়তেন।

একবার স্কুল পরিদর্শনে আসেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পরিদর্শন শেষে চলে যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু কয়েকজন ছাত্রসহ তাঁদের সামনে স্কুলের সমস্যা সমাধানের দাবি তুলে ধরে বলেন, বৃষ্টির সময় স্কুলের হোস্টেলের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। ফলে ছাত্রদেরও অসুবিধা হয়। পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়।

মন্ত্রী দুজনই স্কুল ছাত্রের সাহসী ভূমিকা দেখে খুশি হন। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন অধিকার আদায়ের জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। সে সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর এই সাহসকে বাহবা দিয়ে অভিনন্দন জানান। নিজস্ব তহবিল থেকে হোস্টেলের ছাদ মেরামতের প্রয়োজনীয় টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। দুজন মন্ত্রীই স্কুলের ছাত্রের ব্যক্তিত্ব দেখে মুগ্ধ হন। তাঁরা বুঝতে পারেন, এ ছাত্রটি অধিকার আদায়ের পক্ষে নির্ভীক, সে অনেক দূরে যাবে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেদিন থেকে এ দীপ্ত কিশোর ছাত্রটিকে ভুলতে পারেননি। তিনি ছাত্রটিকে নিভৃত ডেকে তাঁর সাথে ডাক বাংলায় দেখা করার জন্য বললেন। যথাসময়ে ছাত্রটি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। দীক্ষা নিলো এক নতুন জীবনের। সে জীবনের নাম সংগ্রাম। সংগ্রামী জীবনের নব দীক্ষিত সেই কিশোর ছাত্রটিই শেখ মুজিব। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু। সেখান থেকেই শেখ মুজিবের রাজনীতি শুরু।

১৯৪০ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের ছাত্র থাকাকালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এ সময়ে তিনি এক বছরের জন্য নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে বাইশ বছর বয়সে শেখ মুজিব মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন। মাঝখানে ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর চোখ অপারেশন করতে হয়। যার জন্য তিনি তিন বছর স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে বসে পড়ালেখা করেন এবং তিন বছর পর ১৭ বছর বয়সে আবার সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ছেলেবেলা থেকে শেখ মুজিবের ফুটবল খেলায় ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। তিনি নানা জায়গায় হায়ারে খেলতে যেতেন। তাঁর ক্রীড়া নৈপুণ্য সকলকে মুগ্ধ করত। ফলে খেলোয়াড় হিসেবে বেশ নামডাক ছিল তাঁর। সিনিয়রদের পরের বয়সি দলটাতেও তিনি তাঁর নিজের গুণে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

এমনি খেলোয়াড়ি জীবনে হায়ারে খেলতে যেয়ে অনেকদিন পর বাড়ি ফেরায় বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ভীষণ রেগে গিয়ে গৃহশিক্ষক রেখে ছেলেকে শাস্তি করার ব্যবস্থা নিলেন। সে ব্যবস্থাও টিকল না। কারণ গৃহশিক্ষক বেচারী তো নিয়মিত আসেন, কিন্তু ছাত্র খোকাই তো থাকে না, পড়াবেন কাকে? বাবা-মা ভাবলেন এভাবে হবে না। তাহলে কী করা যায়, চিন্তায় পড়ে গেলেন। অবশেষে ঠিক করলেন তাঁরই ক্লাসের গরিব অথচ মেধাবী ছেলে একজনকে রাখতে হবে। তাঁর ক্লাসের ফাস্ট কী সেকেন্ড বয় ঠিক করলেন। বাহির বাড়িতে একটি ছনের ঘর তৈরি হলো। সেখানে দুটো চৌকি, দুটো পড়ার টেবিল দেওয়া হলো। সবাই ভাবলেন, খোকা এখানে তার সাথে থাকবে এবং একত্রে পড়ালেখা হবে, বাড়ির সকলের এই ছিল আশা। সবই ঠিকঠাক মতো হলো। কিন্তু তাঁকে পড়ালেখায় বসানো যাচ্ছে না কিছুতেই। একদিন তাঁর সাথে থাকা ছেলোটিকে বলল, দেখ মুজিব তুই যদি পড়ালেখা না করিস তাহলে চাচা মিয়া জিজ্ঞেস করলে আমি কী জবাব দেবো। বঙ্গবন্ধু তার কানের কাছে গিয়ে বললেন, খামাখা ঝামেলা বাধিয়ে কী লাভ? তোর ধাকা খাওয়ার নিশ্চিত জায়গাটা হারাবি কেন? তোর কিছুই বলতে হবে না, চুপচাপ থাক। বললই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু দশ-পনেরো দিন হয়ে গেল তাঁর কোনো পাত্তা নেই। এদিকে বন্ধুটির গুটিবসন্ত হলো। ওই ঘরটার মধ্যে ছেলোটিকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকছে, তার সেবা করার কেউ নেই। কে খাবার দেয়, কে গুশ্রম্বা করে? এমনিভাবে কেটে যেতেই এক দিন শেখ মুজিব এসে হাজির। দেখেন ঘরের দরজা ভেড়ানো, ভেতর থেকে বন্ধ। জোর দিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দেখেন এক অদ্ভুত কাণ্ড, টেবিলের উপর খাবারের বাসনকোসন জমে আছে গাদা খানেক। এ দৃশ্য দেখে তিনি খুব ক্ষেপে গেলেন। নিজের গায়ের কাপড় ছেড়ে ঘরের সব নোংরা পরিষ্কার করলেন আর বন্ধুটির সেবায় নিয়োজিত হলেন। প্রথমে বাড়ির লোকজনের উপর রাগ হলো তাঁর। তারপর তিনি সব গুছিয়ে নিলেন।

বাজার থেকে নতুন তোষক, বালিশ, চাদর কিনে আনলেন। মশারিও বাদ পড়ল না। কোথায় নিমপাতা পাওয়া যায়, নিয়ে এসে তিনি বিছানায় ছড়িয়ে দিলেন। নিমপাতা দিয়ে বন্ধুটিকে বাতাস করলেন। যা খাওয়ানো উচিত তাই খাওয়াচ্ছেন। নিমপাতার পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন-এভাবেই করলেন বন্ধুটির যত্ন আত্তি। মুজিবের প্রাণান্তরূপ সেবায় ছেলোটিকে মরণ রোগ গুটিবসন্ত থেকে সেরে উঠল।

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এমনি খেলা পাগল ছেলোটিকে খেলা ছেড়ে দিনরাত অসুস্থ বন্ধুর সেবা করেছেন। তখন সবাই দেখলেন কত মহানুভব এই শেখ মুজিব। এভাবেই বঙ্গবন্ধু শত সহস্র উদার কর্ম, মহানুভবতা, দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে হয়েছেন 'খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু'। সকল বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার সাহস, শিক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা দিয়ে টুঙ্গিপাড়ার মতো বাংলাদেশের একটি গ্রাম থেকে জাতিসংঘের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছিলেন বাংলাদেশের নেতা হিসেবে। যিনি সুদীর্ঘকাল নানা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি বাঙালির মহান নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক-আমাদের জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু লজ্জাজনক হলেও সত্য এই যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশ গড়ার কাজে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করছিলেন, সমগ্র জাতিকে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মত্যাগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এ দেশেরই বিপদগামী কতিপয় উচ্চাভিলাষী অফিসার ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর আদর্শ আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমাদের সকলের উচিত তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা। তাহলেই আমরা আমাদের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পাব। ■

লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

## রোগজয়ী বঙ্গবন্ধু

আসিফ আহমেদ

মধুমতী নদীর তীরের জেলা গোপালগঞ্জ। মধুমতীর এক শাখার নাম বাইগার নদী। নদীর দুই তীরে গাছপালা! বুনো ফুলের ঝোপ! বাঁশবন। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। গাছে গাছে ডাকে পাখিরা। নদী বয়ে যায় কুলকুল শব্দে। নদীতে নৌকার মাঝি দরাজ গলায় ভাটিয়ালি গায়। এর পাশে টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। এই টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৭ই মার্চ ১৯২০ বুধবার, সবে ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে। টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ বংশের টিনের বাড়ি থেকে এক বয়স্ক গ্রাম্য দাই ছুটে এসে বললেন, 'খোকা হয়েছে, আজান দে।' আজান দিয়ে সবাইকে জানানো হলো খুশির খবর। দুই কন্যার পর প্রথম

পুত্রসন্তান। বঙ্গবন্ধুর নানা শেখ আবদুল মজিদ আকিকার সময় নাম রাখলেন শেখ মুজিবুর রহমান। মেয়েকে বললেন, 'মা সায়েরা, তোর ছেলের এমন নাম রাখলাম যে নাম জগদ্বিখ্যাত হবে।' সত্যি সত্যি খ্যাত হয়েছে সে নাম। তিনি মিশে আছেন আমাদের রক্তে। আমাদের অন্তর আলোকিত হয়ে আছে তাঁর আদর্শে।

শৈশবে গ্রামের মেঠোপথের ধুলো মেখে, বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে, শীতের কুয়াশার শিশির পায়ে মেখে, হেমন্তের নীল আকাশের তলায়, বাইগার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আর সঁতার কেটে, ফসলের মাঠে ঘুরে ঘুরে বড়ো হতে লাগলেন মুজিব। বাংলার প্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। এই দেশটি তাঁর অন্তরের সবখানি জায়গা দখল করে সেই শৈশবেই।

একদিন একটা শালিক পাখির ছানা ধরে আনলেন। আরেক দিন একটা ময়না পাখির ছানা। অতি যত্নে ছানা দুটিকে খাওয়ান। বানর ও কুকুর পুষতে লাগলেন। এই প্রাণী দুটি এত ভক্ত হলো তাঁর, তিনি





যা বলেন তাই করে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ততক্ষণ বানর আর কুকুর আছে তাঁর সঙ্গে। শালিক পাখির ছানা আর ময়না পাখির ছানা কথা বলতে শিখেছে। শিস দিতে শিখেছে। এসব পোষা পাখি আর জীবজন্তুর প্রতি অপরিসীম মমতা তাঁর। এদের কেউ অবহেলা করলে তা সহ্য করতে পারতেন না।

তবে ছেলেবেলা থেকেই মুজিব ছিলেন খুব রোগা। মা সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন কীভাবে তাঁর শরীর ভালো করা যায়। বড়ো বোনেরাও খেয়াল রাখতেন ভাইয়ের দিকে। ছোট্ট বয়সেই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতেন। গ্রামের এ বাড়ি ও বাড়ি যাচ্ছেন। প্রত্যেকের খবর নিচ্ছেন। ছিল এক ধরনের ব্যস্ততা।

অন্য দিকে মায়ের ব্যস্ততা তাঁর খোকাকে নিয়ে। খোকার শরীর কীভাবে ভালো রাখা যায়। দুধের গ্রাস নিয়ে ছেলের পেছনে ছুটছেন। ঘরে তৈরি হচ্ছে ছানা, মাখন, ঘি। সময়মতো ছেলেকে সেসব খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। বাগানের ফল আর নদীর তাজা মাছ হাতের কাছে রাখা হচ্ছে। তারপরও খোকার স্বাস্থ্য ভালো হয় না। ছিপছিপে পাতলা শরীর। এই নিয়ে মায়ের আফসোসের সীমা নেই। বাড়ির এত ভালো ভালো খাবারের দিকে মোটেই নজর ছিল না মুজিবের। তিনি পছন্দ করেন ভাত, মাছের ঝোল, ডাল আর সবজি। খুবই সাধারণ খাবার। তবে সবশেষে দুধভাত, কলা ও গুড় থাকতে হবে।

১৪ বছর বয়সে হঠাৎ কিশোর মুজিবুরের পা হঠাৎ ফুলে যেতে থাকে। প্রায়ই বমি বমি ভাব ও শরীরে তীব্র ব্যথা সৃষ্টি হয়। হাতে-পায়ে বোধশক্তি থাকে না এবং হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়। প্রাণচঞ্চল ফুটবল মাঠের লড়াই খেলোয়াড় মুজিব ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে খেলাধুলা ও পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। শয্যাশায়ী মুজিবুরের অনেক পরীক্ষা করে কলকাতার ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য এবং ডা. এ কে রায় চৌধুরী রোগ নির্ণয় করেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, আতপ চালের পায়সের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের জন্য এবং খাদ্যে ভিটামিন বি-১

অভাবজনিত কারণে বেরিবেরি রোগ হয়েছে মুজিবের। ভিটামিন ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা শুরু হলো এবং ঠিক করে দেওয়া হলো নিয়মিত কেবল টেকিভাঙা চালের ভাত, ছোটো মাছ এবং প্রচুর মটরগুটি ও শাকসবজি খেতে। ধীরে ধীরে বেরিবেরি রোগ থেকে কিশোর মুজিব সুস্থ হয়; কিন্তু চোখের দৃষ্টি বিভ্রাট হলো, গ্লুকোমা হলো, অপারেশন করলেন কলকাতার প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. টি আহমেদ। ১৬ বছর বয়স থেকে কিশোর মুজিবুরের চশমা পরা। তিন বছর খেলাধুলা ও পড়াশোনা বন্ধ থাকল। কয়েক বছর ভালো কাটলেও ১৯৪২ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষার ঠিক একদিন আগে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর হলো, মামসু হয়ে গলা ফুলে গেল, অসহনীয় মাথাব্যথা ও চক্ষু জ্বালা; পরীক্ষা তেমন ভালো হলো না তবুও ভালোভাবেই গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রাস পাস করেন ও কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন।

কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৪৫ সালে দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে তরুণ শেখ মুজিব বৃকে, পেটে ও সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হন, হেকিম আজমল খান বিদ্যালয়ের একজন হেকিমের চিকিৎসায় দ্রুত সুস্থ হয়ে কলকাতায় বেকার হোস্টেলে ফিরে আসেন। এসব বিবরণ আমরা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পাই।

১৯৪৯ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শেখ মুজিব প্রায় আট বছর কারাবন্দি ছিলেন এবং কারাজীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন অসুস্থতার বিবরণ আছে, শেখ মুজিবুর রহমানের 'কারাগারের রোজনামা'য়।

১৯৫০ সালে গোপালগঞ্জ জেলে থাকাকালে 'দুর্বল হার্ট', চক্ষু যন্ত্রণা ও বাম পায়ে রিউমেটিক ব্যথা হয়, ভীষণ জ্বর ও মাথাব্যথা এবং বৃকে ব্যথা ধরা পড়ে, খুলনা জেলে থাকাবস্থায় চোখের অসুখও বাড়ে। ভালো চিকিৎসার দাবিতে ফরিদপুর জেলে শেখ মুজিব অনশন করেন, জেল চিকিৎসকরা জোর করে

টিউব ঢুকিয়ে তরল খাবার প্রবেশ করালে নাকে ক্ষত সৃষ্টি হয়। হার্টের অবস্থা খারাপ হয়, পালপিটেশন বাড়ে এবং নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়।

১৯৬৬ সালে জেলে থাকাকালে শেখ মুজিব ভোগেন অনিদ্রা ও ক্ষুধামন্দায়। একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে নির্জন কারাবাসেও শেখ মুজিবের মনে দৃঢ়তা অটল ছিল- 'আমাকে বাঁচতে হবে, অনেক কাজ বাকি আছে।'

ঐ বছর জুলাই মাসে পেটের সমস্যা হয়, সাথে যোগ হয় পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত ভয়ানক ব্যথা। পরের বছর প্রায়ই অসহ্য মাথাব্যথা ও চোখের ব্যথায় ভোগেন বঙ্গবন্ধু। ফরিদপুর, খুলনা ও ঢাকার জেলে থাকাকালে সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ হোসেন তার চিকিৎসা করেছেন। সেখানে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ক্যাপটেন এস এ লস্কর এবং মেডিসিন অধ্যাপক এ কে সামসুদ্দিন আহমদ শেখ মুজিবের প্রায় এক মাস চিকিৎসা করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ৯ই মে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্তরবঙ্গ থেকে চারদিনের সরকারি সফর শেষে ঢাকায় পৌঁছেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালের ১৩ই মে সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়,

'প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সকালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চারদিনের ঐতিহাসিক সফর শেষে হেলিকপ্টারে ঢাকা প্রত্যাবর্তনকালে তিনি পেটে ব্যথা অনুভব করেন। বাসসের বরাত দিয়ে দৈনিক পত্রিকায় বলা হয় যে তিনি অসুস্থ বোধ করায় দিনের কর্মসূচি বাতিল করে দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন।' ■

লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক

## আমার দেশ আরিফ হাসান

শস্য-শ্যামল সবুজ বাংলাদেশ  
ছয় ঋতু নিয়ে আমরা আছি বেশ।  
শান্ত শীতল ভোরের হাওয়ায়,  
দোয়েল কোয়েল ডাকে।  
মৌন দুপুরে হাঁসের ঝাঁক  
ডুব দেয় পুকুরে  
ঘাস ফড়িং এর দস্যুপনা!  
দেখে নয়ন জুড়াই  
সে আমারই দেশ,  
সোনার বাংলাদেশ।

অষ্টম শ্রেণি,  
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা



## বইয়ে বইয়ে বঙ্গবন্ধু

পিয়াল খান



বঙ্গবন্ধু ও একটি বাঘের গল্প

লেখক : সৈয়দা নাজমুন নাহার

প্রকাশকাল : ২০১৯ একুশের বইমেলা

মূল্য : একশত টাকা মাত্র।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবদ্দশায় ঢাকা চিড়িয়াখানায় একটি বাঘ শাবক দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বনের অবোধ এ প্রাণীটিরও যে করুণ পরিণতি ঘটে, বইটিতে তারই বিশদ বিবরণ রয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতার হাত থেকে অবলা প্রাণীও রক্ষা পায়নি। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। সত্য কখনো চাপা থাকে না।

মানবিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান  
লেখক : সৈয়দা নাজমুন নাহার  
প্রকাশকাল : ২০২১ একুশের বইমেলা  
মূল্য : একশত টাকা মাত্র।



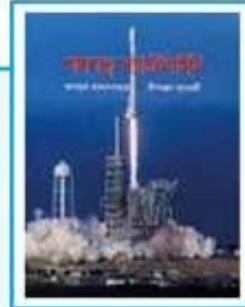
পৃথিবীর মহান নেতাদের জীবনী থাকে বর্ণিল।  
এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর জীবনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি  
বরং আরো বেশি মানবিক। জীবনের সিংহভাগ  
কেটেছে কারাগারের অন্তরালে। শৈশব থেকেই  
প্রতিবাদী আর মানবদরদি ছিলেন তিনি।  
পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বাড়ির দরজা  
সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। একমাত্র  
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ধানমন্ডির  
বত্রিশ নম্বর সড়কের বাড়িটি সবার জন্য ছিল  
উন্মুক্ত। বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে কেউ কখনো  
খালি হাতে ফেরেনি।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

লেখক : অপরেশ বন্দোপাধ্যায় - দীপাঞ্জন ব্যানার্জী

প্রকাশকাল: ২০২০ একুশের বইমেলা

মূল্য : একশত টাকা মাত্র।



বইটির শুরুতেই আছে কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা। কৃত্রিম উপগ্রহ কি, তার কার্যকারিতা কি, সেই সাথে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের যোভাবে শুরু, এর ব্যয়, স্যাটেলাইট নির্মাণ, দেখতে কেমন বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-এর মহাকাশ যাত্রা। উড্ডয়ন স্থান এবং স্পেসফিকেশন। উৎক্ষেপণের পরের কাজ, গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট এর সুবিধা, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে যুক্ত হলো টিভি চ্যানেল ও ব্যাংক। মূল কথা এক নজরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। বইটি ছোটো-বড়ো সব শ্রেণির পাঠকের নজর কাড়বে আশা করি। এখানে একটি কথা না বললেই নয়, লেখক দীপাঞ্জন ব্যানার্জী-এর এটি প্রথম গ্রন্থ, লেখককে অভিনন্দন।

নিবন্ধ

## বিশ্বজুড়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালন

মো. জামাল উদ্দিন



গোপালগঞ্জের নিভৃত পল্লি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। আর এই দিনটিকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদযাপন করছে মুজিবের সকৃতজ্ঞ দেশবাসী আর অনুসারীরা। পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী।

**ভারত:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিন উপলক্ষে নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিনটি পালন করছে। এদিন সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মান্যবর হাই কমিশনার মুহাম্মদ ইমরান। পরে তিনি দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমালা প্রদান করেন।

**জাপান:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করেছে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। সকালে অনুষ্ঠানের শুরুতে দূতাবাস

প্রাঙ্গণে দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ। পরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে রাষ্ট্রদূত কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশু দিবস উপলক্ষে শিশুদের প্রতিনিধি হিসেবে দুইজন বক্তব্য প্রদান করে।

**সিঙ্গাপুর:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিন উপলক্ষে সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাই কমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিনটি পালন করা হয়। এদিন চ্যাপারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু করেন হাইকমিশনার জনাব মো. তৌহিদুল ইসলাম, এনডিসি।

**ইতালি:** ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালি। ডিজিটাল প্র্যাটফর্মে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা

আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন, বাণী পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

**ফিলিপাইন:** যথাযথ শ্রদ্ধায় ও আনন্দমুখর পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন করেছে ফিলিপাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। সকালে দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর রষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়াম ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

**দুবাই:** বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুবাই -এর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এইদিন কনস্যুলেট হলরুমে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এসময় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রধান প্রভাষ লামারং-এর পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দুবাই কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল জেনারেল মো.সাহেদুল ইসলাম, লেবার কাউন্সেলর ফাতেমা জাহান, কমার্শিয়াল কাউন্সেলর কামরুল হাসান প্রমুখ

**লন্ডন :** বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশুদিবস 'চিরন্তন মুজিব' শীর্ষক এক বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করেছে লন্ডন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে শিশু-কিশোরদের পাঠ, 'বঙ্গবন্ধু ও ব্রিটেন' বিষয়ে তিন শতাধিক ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরের চিত্রাংকন ও জাতির পিতা শীর্ষক বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গীকৃত শিশু-কিশোরদের এক বিশেষ সংগীত পরিবেশনা ছিল দিবস উদযাপনের মূল আকর্ষণ।

এছাড়া বিশ্বের আরো অনেক দেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়। ■



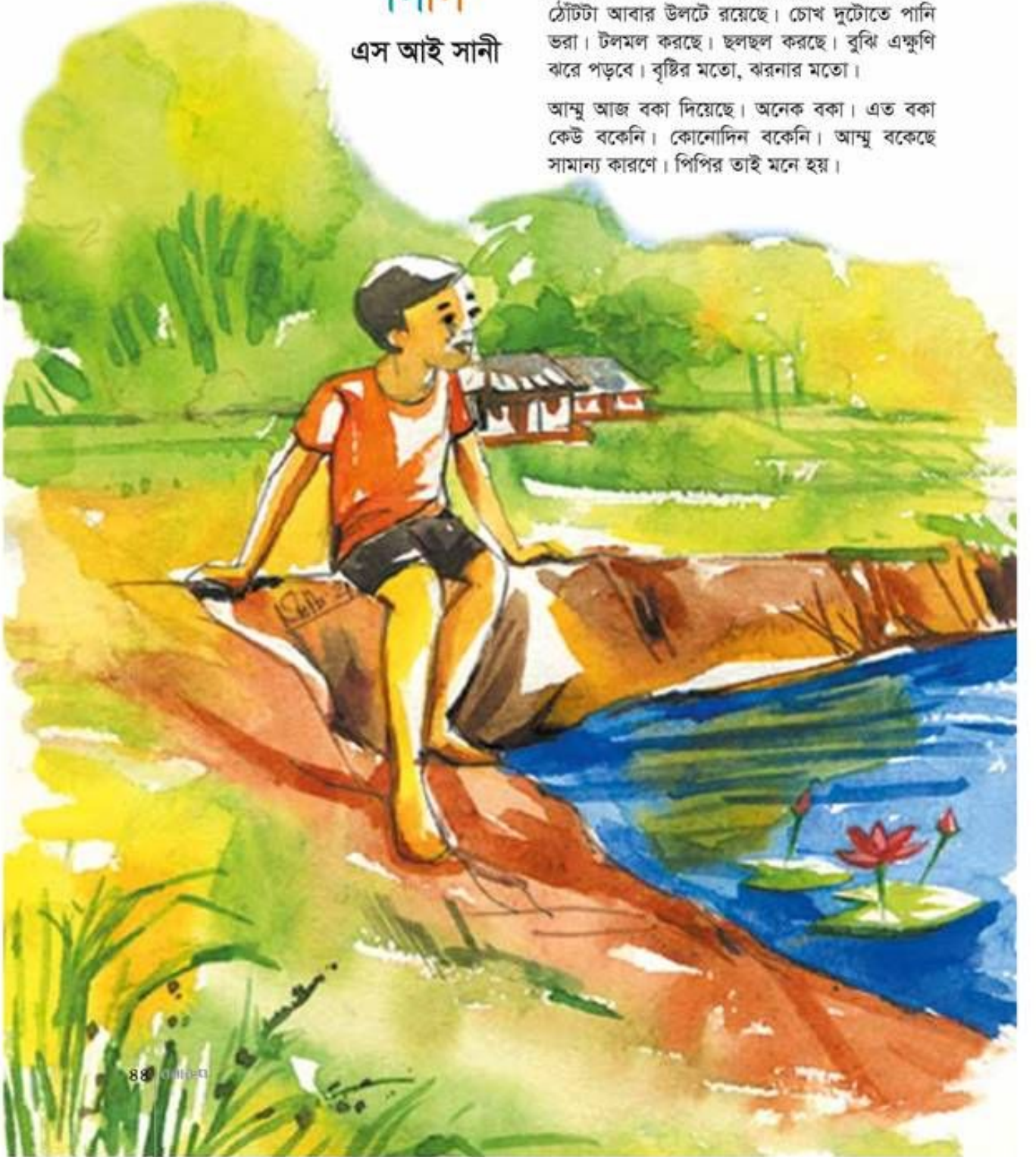
মো. ইহসানুল হক বসুনীয়া (সিফাত), কেজি শ্রেণি, লিটল এঞ্জেল স্কুল, মুগদা, ঢাকা

গল্প

## পিপি এস আই সানী

বড্ড অভিমান জমেছে মনে। মুখটা ভার হয়ে আছে। ফরসা মুখ কালো হয়ে গেছে। এক টুকরো মেঘ যেন। ঠোঁট দুটোও ফুলে আছে। নিচের ঠোঁটটা আবার উলটে রয়েছে। চোখ দুটোতে পানি ভরা। টলমল করছে। ছলছল করছে। বুঝি এক্ষুণি ঝরে পড়বে। বৃষ্টির মতো, ঝরনার মতো।

আম্মু আজ বকা দিয়েছে। অনেক বকা। এত বকা কেউ বকেনি। কোনোদিন বকেনি। আম্মু বকেছে সামান্য কারণে। পিপির তাই মনে হয়।



শুধু কি বকেছে? মোটেও না। বলেছে- বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও! কী সাংঘাতিক কথা! এতটুকুন পিপি। কোথায় যাবে? যাওয়ার কি জায়গা আছে? নানুর বাড়ি? সেই কতদূর! কত কত গাড়ি চড়তে হয়। কত রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। কত নদী পার হতে হয়। কত গ্রাম পেরুতে হয়। অত কিছু কি পিপি পেরুতে পারে? তাহলে কেমনে যাবে নানুর বাড়ি?

আর দাদুর বাড়ি? সেও তো অনেক দূরে! ট্রেনে চড়তে হয়। অনেকক্ষণ ধরে ট্রেন ছুটে চলে। হুইসেল বাজিয়ে। ঝকঝক ঝনঝন একটানা। তারপর ট্রেন থেকে নামতে হয়। মটরভ্যানেরে উঠতে হয়। সে মটরভ্যানেরে অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। তারপর গ্রামে পৌঁছায়। তারপরেই না শানুর বাড়ি। এত কিছু পিপি পারবে কি করে? সে তো এখনো অনেক ছোটো। কেবল নার্সারিতে পড়ে। অত ছোটো মানুষ কি একা একা অতদূর যেতে পারে! সবসময় তো সে আক্সু-আম্মুর সাথে যায়। সে কি আর একা একা কখনো গিয়েছে! তাছাড়া পিপির টিচার বলেছে, একা একা যেন কোথাও না যায়। দুট্ট লোকে ধরবে। তাই তো পিপি একা একা কোথাও যায় না। কেউ ডাকলেও না। কারো দেওয়া কোনো খাবারও খায় না। কত ভালো পিপি। অথচ আম্মু আজ খুব বকেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে।

পিপি একবার ভেবেছে- আচ্ছা, বাড়িটা কি আম্মুর? নাকি আক্সুর? নিশ্চয়ই আম্মুর! না হলে আম্মু কেন বেরিয়ে যেতে বলবে? ইশ! বাড়িটা যদি আক্সুর হতো! আক্সু অত বড়ো চাকরি করে, তাও একটা বাড়ি বানাতে পারে না! আক্সু আজ বাড়ি আসুক, আচ্ছা করে বকা দেবে পিপি! কিন্তু, আক্সুর সাথে দেখা হবে কী করে! পিপিকে তো বের হতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে! পিপির তো কিছুই চেনা নেই। কিছুই জানা নেই। ভেবে কূল পায় না পিপি।

অনেক ভেবে পিপি বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বের হলো। গালটা আগের মতো ফুলে আছে। কমলালেবুর মতো ঠোঁটও। তবে চোখ দুটো আর টলমল করছে না। কেবল ভিজে আছে।

পিপি হাঁটতে হাঁটতে বিলের পাশে এসে দাঁড়াল। খানিকদূরে বিলের মধ্যে ছোট্ট একটা টিবি। টিবিতে

দুটো কলমিলতা গাছ। ফুলও ফুটেছে। বাতাসে দুলছে এদিক-ওদিক। পিপি আইল বেয়ে টিবির ওপর গিয়ে বসল। এখানেই বসে থাকতে চায় পিপি সারাদিন।

বিলে এখন অল্প পানি। বর্ষাকাল চলে গেছে। তাই পানি কমে যাচ্ছে। অল্প পানিতে শাপলা ফুল ফুটে আছে। শাপলা ফুল পিপির অনেক প্রিয়। কিন্তু আজ ভালো লাগছে না। ঐ যে অভিমান হয়েছে সেজন্য। এখন অভিমানের সাথে রাগও হচ্ছে আম্মুর ওপর। আম্মু পচা। আক্সু ভালো। মারে না বকে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে না। খালি আদর করে। অনেক আদর। চকলেট এনে দেয়। বিস্কুট এনে দেয়। হরলিঙ্গ এনে দেয়। আরো কত কী! কত ভালো পিপির আক্সু! কিন্তু আক্সু তো এখন অফিসে। আক্সুর অফিসও তো পিপির চেনা নেই। কার কাছে যাবে তবে সে! আক্সুটা এখন থাকলে কত না ভালো হতো! পিপির অভিমান হয় আক্সুর ওপর। অভিমানে গাল ফুলে ওঠে আরো বেশি। বেলুনের মতো। চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি বেরোয়। টপ করে ঝরে পড়ে। বিলের পানিতে মিশে যায়।

হঠাৎ একটা ব্যাঙের ছানা পানির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পিপির সামনে আসে। তারপর একটা পা পিছন দিকে মেলে দেয়। আর একটা হাত সামনে মেলে দেয়। তারপর গালটা হা করে একটা ডিগবাজি খায়। কিন্তু পিপির হাসি পায় না। রাগ হয়। ব্যাঙ ছানাটি আরো একটু সামনে আসে। মাথাটা উঁচু করে গালটা আবার হা করে। ওমা! ব্যাঙ ছানা যে এবার কথা বলে উঠল!

'পিপি, তুমি কেমন আছো?'

ব্যাঙ ছানার কথা শুনে পিপি চোখ পাকিয়ে তাকায়। উত্তর দেয় না। পিপির চোখ পাকানো দেখে ব্যাঙ ছানা ভয় পায়। দূরে সরে যায়। তারপর বলে ওঠে- 'পিপি, তুমি পচা!'

ব্যাঙ ছানার কথা শুনে পিপির খুব রাগ হয়। ব্যাঙ ছানাকে রাগ দেখায়। পিপির রাগ দেখে ব্যাঙ ছানা ভয় পায়। ডুব দিয়ে শাপলা পাতার নিচে গিয়ে লুকোয়। এমন সময় কোথেকে একটা ফড়িং ছানা উড়ে আসে। কলমিলতার ফুলে বসে। বাহ, ভারি সুন্দর তো ফড়িংটা। লাল রং। সুন্দর দেখতে। কিন্তু

ফড়িংও কি পিপিকে পচা বলবে? পিপির রাগ হয় আবার। চোখ পাকিয়ে তাকায় ফড়িংয়ের দিকে। আড়চোখে দেখে ফড়িং ছানা।

‘পিপি, তুমি ভারি বদ। তোমাকে আমি কিছু বলেছি? অমন করে তাকালে কেন আমার দিকে?’ লেজ দুলিয়ে কথাগুলো বলে ওঠে ফড়িং ছানা। চোখ পাকিয়ে তাকায়। দাঁত কটমট করে। তারপর উড়ে যায়। পিপি কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভাবে তাই তো! ফড়িং ছানা তো আমাকে কিছু বলেনি। ব্যাঙ ছানার ওপর রাগ করে ফড়িং ছানার সাথে শুধু শুধু খারাপ আচরণ করলাম। একদম ঠিক হয়নি কাজটা। মন খারাপ হয় পিপির। অভিমানী হয়ে বসে থাকে চূপটি করে।

এমন সময় একদল মেঘপরি উড়ে আসে। পিপির মন খারাপ দেখে একটা মেঘপরি নিচে নামে। কলমিলতার ডালে বসে। নুয়ে পড়ে কলমিলতার ডাল মেঘপরি ভাঙে। পিপি অভিমান ভরা চোখে তাকায় মেঘপরি দিকে। মেঘপরি দরদভরা কণ্ঠে বলে-

‘কী ব্যাপার পিপিসোনা? তোমার মন খারাপ কেন?’ বলতে বলতে পিপির গালে হাত বুলিয়ে দেয় মেঘপরি। পিপি চোখের মণি দুটো উপরে তুলে মেঘপরি দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না। মেঘপরি আবার জিজ্ঞেস করে-

‘কী হয়েছে, বলবে না? মিষ্টি বাবুটার মন খারাপ কেন?’

এবার মুখ তুলে তাকায় পিপি। অভিমানী কণ্ঠে বলে-

‘আচ্ছা মেঘপরি, তুমি বলো তো, আমি কি পচা?’

পিপির কথা শুনে মেঘপরি মুচকি হাসে। বলে-

‘কে বলেছে এমন কথা?’

‘ব্যাঙ ছানা আর ফড়িং ছানা।’ গাল ভর্তি অভিমান নিয়ে বলে পিপি। মেঘপরি মুচকি হেসে বলে-

‘তাই?’

মাথা উপর-নিচ করে সায় দেয় পিপি। মেঘপরি আবার মুচকি হেসে বলে-

‘ব্যাঙ ছানা আর ফড়িং ছানাই আসল পচা, তুমি খুব মিষ্টি ছেলে। ভালো ছেলে। সোনাপিপি।’

মেঘপরি কথা শুনে ফিক করে হেসে ওঠে পিপি।

পিপি এবার বায়না ধরে মেঘপরি কাছে। মেঘের দেশে যাওয়ার। মেঘপরি বলে-

‘তুমি কি সত্যি সত্যি যেতে চাও?’ পিপি সায় দেয়। মাথা উপর-নিচ করে। বলে-

‘হ্যাঁ, তুমি আমাকে নিয়ে চলো। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।’ মেঘপরি বলে-

‘বেশ! চলো তবে।’

মেঘপরি পিপিকে পিঠে উঠিয়ে নেয়। তারপর উড়ে চলে আকাশের দিকে। মেঘের ডানা ঝাপটে। উড়তে উড়তে উপরে ওঠে। অনেক উপরে। চারিদিকে এখন সাদা আর সাদা ধবধবে তুলোর মতো নরম কোমল। পিপি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চারিদিকে। অবাক হয়। বিস্মিত হয়। এত তুলো কোথেকে আসলো? কে ছড়িয়েছে? প্রশ্ন করে পিপি। ওর কাছে সাদা মেঘগুলো তুলো মনে হয়। মেঘপরি বলে-

‘এগুলো তুলো নয়। মেঘ। সাদা মেঘ। এটা সাদা মেঘের রাজ্য। এখানে কেবল সাদা মেঘেরাই থাকে।’

‘তুমি কি শরতের আকাশ দেখেছো পিপি?’ এবার প্রশ্ন করে মেঘপরি। পিপি সায় দেয়। বলে-

‘হ্যাঁ, দেখেছি। শরতকালে নদীর তীরে কাশফুল ফোটে আর আকাশ বেয়ে সাদা মেঘ উড়ে যায়।’

‘ঠিক বলেছো। ওই সাদা মেঘগুলো এখন থেকে যায়। সারা পৃথিবী উড়ে বেড়ায়। তারপর শরতের শেষে আবার এই রাজ্যে ফেরত আসে। আর কিছু সাদা মেঘ ফিরতে পারে না। ওরা ফুল হয়ে যায়। কাশফুল। ফুটে থাকে নদীর তীরে থোকা থোকা।’

মেঘপরি কথা শুনে পিপি অবাক হয়। সেই সাথে আনন্দ পায়। মজা পায়। ভালো লাগে।

মেঘপরি উপরে উঠতে থাকে। আরো উপরে। সাদা মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে। অনেক উপরে।

পিপি এবার খেয়াল করে, চারিদিকে ধূসর আর ধূসর। ধোঁয়ার মতো ঘন। মেঘপরি বলে-

‘এগুলো কিন্তু ধোঁয়া নয়। এগুলো ধূসর মেঘ। আর আমরা এখন ধূসর মেঘের রাজ্য পেরিয়ে যাচ্ছি।’

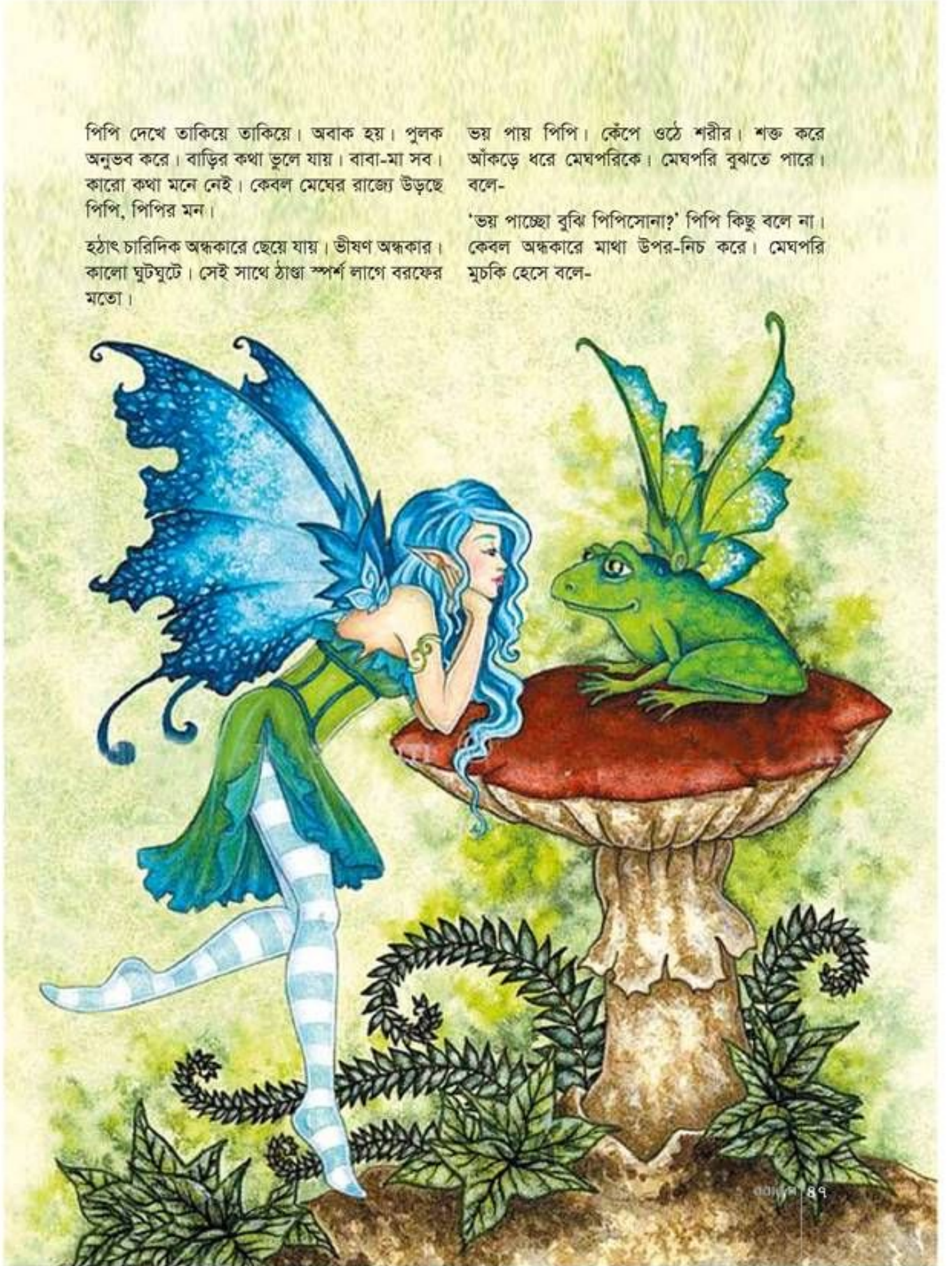


পিপি দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। অবাক হয়। পুলক অনুভব করে। বাড়ির কথা ভুলে যায়। বাবা-মা সব। কারো কথা মনে নেই। কেবল মেঘের রাজ্যে উড়ছে পিপি, পিপির মন।

হঠাৎ চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ভীষণ অন্ধকার। কালো ঘুটঘুটে। সেই সাথে ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগে বরফের মতো।

ভয় পায় পিপি। কেঁপে ওঠে শরীর। শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মেঘপরিকে। মেঘপরি বুঝতে পারে। বলে-

'ভয় পাচ্ছে বুঝি পিপিসোনা?' পিপি কিছু বলে না। কেবল অন্ধকারে মাথা উপর-নিচ করে। মেঘপরি মুচকি হেসে বলে-



'ভয় পেও না, পিপিবাবু। এগুলো অন্ধকার নয়। কালো মেঘ। আমরা এখন কালো মেঘের রাজ্য পাড়ি দিচ্ছি।'

মেঘপরি কথায় পিপি ভয় কেটে যায়। বলে-

'ও তাই?' মেঘপরি 'হুমম' বলে সায় দেয়। পিপি আবার প্রশ্ন করে-

'আচ্ছা মেঘপরি, এই মেঘগুলো এত কালো কেন?' মেঘপরি বলে-

'এরা পৃথিবীতে গিয়ে বৃষ্টি হয়। আর বৃষ্টি হওয়ার জন্য এরা কালো হয়।'

'কালো না হলে বৃষ্টি হওয়া যায় না?' প্রশ্ন করে পিপি। মেঘপরি উত্তর দেয়-

'নাহ্। বৃষ্টি হতে গেলে আগে কালো হতে হয়।'

এমন সময় পিপি দেখে কালো মেঘগুলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। চারিদিকে এখন কেবল নীল আর নীল। আকাশি-নীল। কী চমৎকার! মনোরম মনোলোভা সুন্দর। দেখে মন ভরে যায় পিপি। বলে-

'আমরা কি আকাশে এসে গেছি, মেঘপরি?' মেঘপরি হেসে বলে-

'আকাশ তো সেই কখন পেরিয়ে এসেছি।'

'তাহলে এখানে এত নীল কেন?' ফের প্রশ্ন করে পিপি। মেঘপরি বলে-

'কারণ, আমরা এখন নীল মেঘের রাজ্যে।'

'মেঘ নীলও হয়?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে পিপি। মেঘপরি বলে-

'হয়। আরো কত রঙের হয়!'

একটু থেমে মেঘপরি প্রশ্ন করে-

'আচ্ছা পিপি, তুমি জানো, আকাশ কেন নীল হয়?'

ডানে-বায়ে মাথা নাড়ে পিপি। বলে-

'তুমিই বলো, কেন নীল হয়?'

'কারণ, এই নীল মেঘগুলো আকাশে গিয়ে ছড়িয়ে থাকে। তাই আকাশ নীল দেখায়।' মেঘপরি এমন কথা শুনে খুব অবাক হয় পিপি। বিস্ময় জাগে মনে। সেই সাথে প্রচুর আনন্দ পায়। মনে মনে ভাবে,

ভাগ্যিস মেঘপরি সাথে এসেছিল। নইলে এত কিছু তার জানা হতো না। দেখা হতো না।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মেঘপরি। পিপি ভাবনা শেষ হয়। তাকিয়ে দেখে, এ আরেক মেঘের রাজ্য। চারিদিকে কত চমৎকার! কত মনোরম! কত রঙের মেঘ! শুনে শেষ করতে পারবে না পিপি। সব রঙের নামও তো তার জানা নেই। পিপি কেবল দু-চোখ ভরে দেখে। মন ভরে দেখে। নানান আকৃতির মেঘ দেখে।

মেঘপরি বলে-

'আমরা এসে গেছি আমাদের রাজ্যে। এখন তুমি ইচ্ছেমতো ঘুরে ঘুরে দেখতে পারো।'

পিপি মেঘপরি পিঠ থেকে

নামে। পা রাখে মেঘের জমিনে। নরম জমিন। কোমল তুলতুলে। শিরশির করে পা। খিলখিল করে হেসে ওঠে পিপি।

মেঘপরি হাত ধরে ছুটে বেড়ায় পিপি। এদিক-ওদিক। দু-চোখ ভরে দেখে মেঘের দেশ। মেঘের রাজ্য। চারিদিকে মেঘ আর মেঘ। নানান রঙের মেঘ। চোখ জুড়ানো। মন ভোলানো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়  
মেঘপরি। পিপি ভাবনা  
শেষ হয়। তাকিয়ে দেখে, এ  
আরেক মেঘের রাজ্য।  
চারিদিকে কত চমৎকার!  
কত মনোরম! কত রঙের  
মেঘ! শুনে শেষ করতে  
পারবে না পিপি। সব রঙের  
নামও তো তার জানা নেই।  
পিপি কেবল দু-চোখ ভরে  
দেখে। মন ভরে দেখে।  
নানান আকৃতির মেঘ দেখে।

পিপি দেখে- সামনে একটি মেঘের নদী। নদীতে মেঘের নৌকো ভেসে চলেছে। নৌকোর পালও মেঘের। দেখে মন ভরে যায় পিপির।

একটু পর দেখতে পায় মেঘের রাস্তা। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। গাড়িগুলোও মেঘের। আরেক পাশে যেতে যেতে পিপি দেখতে পায়- বিশাল বড়ো বড়ো মেঘের পাহাড়। পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নেমে এসেছে। ঝরনাও মেঘের। পিপি যত দেখছে, তত মুগ্ধ হচ্ছে। মুগ্ধতার কোনো শেষ নেই। মেঘপরি হাত ধরে আরো কতকিছু দেখতে লাগল পিপি।

পিপি হঠাৎ দেখল তার সামনে একদল মেঘপরি। উড়ে উড়ে খেলা করছে। একেকটা একেক রঙের। তাদের দেখে পিপি থমকে দাঁড়াল। পরিগুলো কী সুন্দর! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পিপি। মেঘপরি বলল-

'বলো তো পিপি, এই ঞালপরি, নীলপরি, সবুজপরি, হলুদপরি, কমলাপরি, বেগুনিপরি আর আসমানিপরি- এই সাতটি পরি কারা?' পিপি বিস্ময় নিয়ে তাকাল মেঘপরি দিকে। মাথা নাড়ল ডানে বাঁয়ে। মেঘপরি বলল-

'এরা হচ্ছে রংধনু। বৃষ্টির সময় পৃথিবীতে যায়। তারপর বৃষ্টির শেষে এই সাতপরি সাতরং- লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, বেগুনি আর আসমানি একসাথে মিলে রংধনু হয়ে আকাশে ভেসে ওঠে।'

মেঘপরি কথা শুনে পিপির বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিপি।

পিপিকে নিয়ে মেঘপরি ঘুরে বেড়াল। রাজ্যময়। ঘুরে ঘুরে আরো কত কিছু দেখল পিপি। তারপর এক সময় ক্রান্তি এসে ভর করল পিপির ওপর। ঘুম নেমে এল চোখে। শরীর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল পিপি।

অনেকক্ষণ পর ঘুম ভাঙল পিপির। ঘুম ভাঙতেই পিপি দেখল- শুয়ে আছে সে, একা। একটা ঘরে মেঘের ঘর। মেঘের খাট, মেঘের তোষক, মেঘের বালিশ। পিপি এমন ঘর দেখে অবাক হয়ে গেল। ঘরের চারদিক মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল পিপির। খিদে পেয়েছে। খিদে পেতেই আম্মুর কথা মনে পড়ে

গেল পিপির। আম্মুর ওপর অভিমান করার পর এই প্রথম আম্মুর কথা মনে হলো খুব করে। বুকের ভেতরটা কেমন হু হু করে উঠল। 'আম্মু' বলে কেঁদে উঠল পিপি। ফুঁপিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে ডুকরে। চোখ থেকে পানি ঝরল ঝরঝর।

পিপির কান্না শুনে মেঘপরি দৌড়ে এল। পিপিকে জড়িয়ে ধরল বুকুর সাথে। আদর করল। গালে হাত বুলিয়ে দিলো। বলল-

'আম্মুর কথা মনে হয়েছে, পিপিসোনা?'

কথা বলতে পারল না পিপি। শুধু উপর-নিচ করে মাথা নেড়ে সায় দিল। মেঘপরি আবার জিজ্ঞেস করল-

'আম্মুকে দেখবে? আম্মুর কাছে যাবে?'

আবার উপর-নিচ করে মাথা নাড়ল পিপি।

পিপির সামনে একটি আয়না ধরল মেঘপরি। মেঘের আয়না। আয়নার মধ্যে পিপি দেখল আম্মুর মুখটা মলিন হয়ে আছে। বড্ড মলিন। পানি ঝরছে চোখ থেকে। কাঁদছে আর 'পিপি' 'পিপি' বলে ডাকছে।

তা দেখে পিপি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'আম্মু' বলে ডেকে উঠল কয়েকবার। মেঘপরি পিপিকে বুকুর সাথে জড়িয়ে ধরল। বলল-

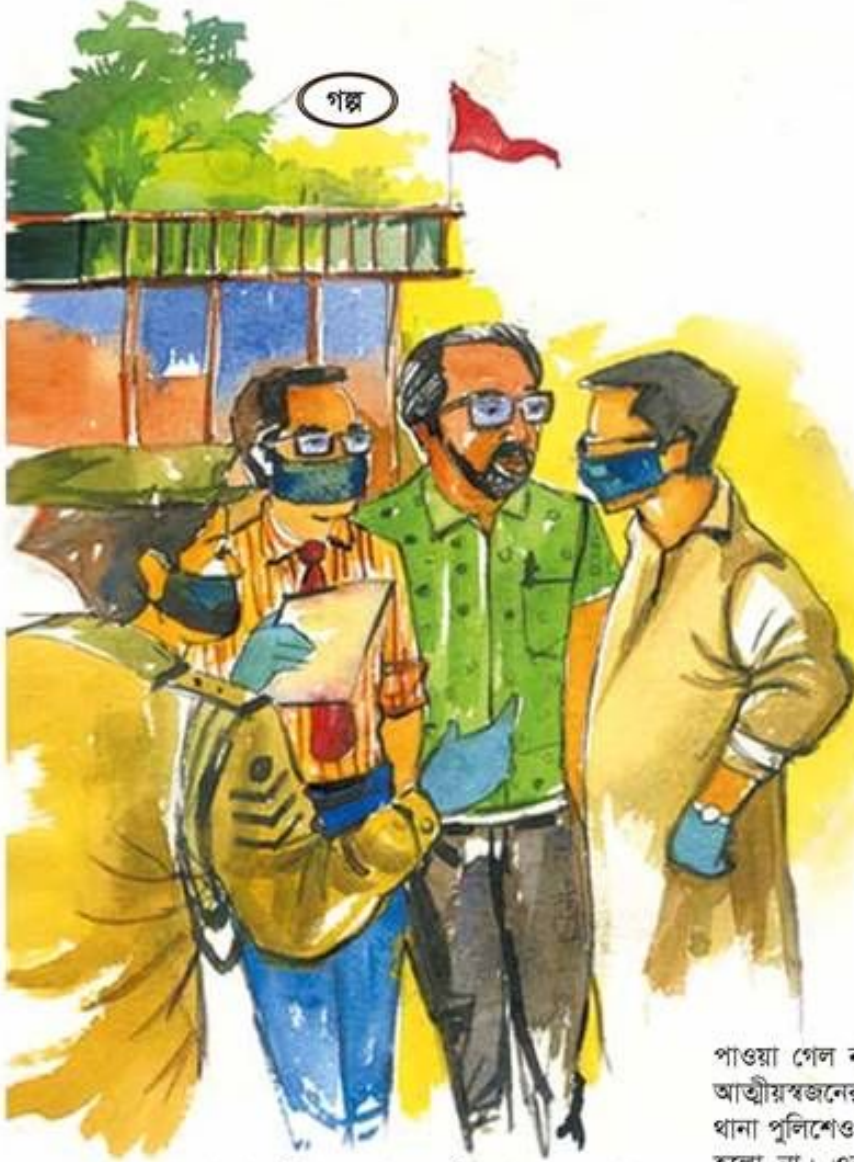
'দেখলে তো পিপি, আম্মু কত ভালোবাসে তোমায়? আম্মু না-হয় রাগ করে একটু বকেছে, তাই বলে আম্মুর ওপর অভিমান করতে হয়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়?'

কথা বলতে পারল না পিপি। শুধু ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল। মেঘপরি বলল-

'আর কেঁদো না পিপিসোনা! এক্ষুণি আমরা আম্মুর কাছে যাবো।'

এই বলে মেঘপরি পিপিকে পিঠে উঠিয়ে নিলো। পিপি শক্ত করে মেঘপরি পিঠে আঁকড়ে ধরল। তারপর মেঘের রাজ্য ছেড়ে মেঘপরি উড়ে চলল পৃথিবীর দিকে। ■

লেখক পরিচিতি: গল্পকার



## আরেক যুদ্ধ মুস্তাফা মাসুদ

করোনা ভাইরাস শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রামেও হানা দিলো! এতদিন নিরাপদেই ছিলাম। টেলিভিশনসহ সরকারি প্রচারণার পাশাপাশি আমার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু কিশোর বাহিনীর সদস্যরাও স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ভালো ফলও হচ্ছিল। কিন্তু গোল বাধালো মধ্যি পাড়ার হারেস শেখের বড়ো ছেলে ফরিদ।

এখানে ফরিদ সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললেই নয়। ফরিদ ছিল আমার সহপাঠী। ক্লাস এইটে থাকতে একদিন কাউকে কিছু না বলেই সে একেবারে হাওয়া। কোথায় গেল! কোথায় গেল! কোনো হদিস

পাওয়া গেল না। ওর বাবা কদিন এখানে-ওখানে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খুঁজলেন। এমনকি গোপনে থানা পুলিশেও পাত্তা লাগালেন, কিন্তু কোনো কিনারা হলো না। ওর মা কদিন আঁচল চেপে কান্নাকাটি করলেন। তারপর আন্তে আন্তে সবাই স্বাভাবিক হয়ে গেল। সংসার চলতে লাগল আগের মতোই। আমরাও একদিন ভুলে গেলাম ফরিদকে।

সেই ফরিদ শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে, কিন্তু সুস্থভাবে ফেরেনি। সে বাড়ি আসার দশ-বারো দিন পর হারেস চাচা এক সন্ধ্যায় আমার কাছে ছুটে আসেন। এসেই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন- বাবা, আমার ছেলেটাকে বাঁচাও! ও মনে হয় করোনায়...

চাচা আর কথা বলতে পারেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন শুধু। আমি তো অবাক। মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে পড়ি যেন। নিজেকে সামলে নিতে

আমার প্রায় মিনিটখানেক লেগে যায়। তারপর বলি-  
কোন ছেলে? আপনার ছোটো ছেলে রশিদ?

- না, ফরিদ।

- ফরিদ!!

- হ্যাঁ বাজান। সে অনেক কথা।

চাচার কথায় জানা গেল, তার নিখোঁজ বড়ো ছেলে  
ফরিদ বাড়িতে এসেছে প্রায় বিশদিন আগে। কিন্তু  
আমরা জানতে পারলাম মাত্র আজ দশ-এগারো দিন  
পরে। চার-পাঁচদিন থেকে সে পুরোপুরি অসুস্থ।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলেই লক্ষণ দেখে  
মনে হচ্ছে। এতদিন গোপনে ঘরেই ছিল। হারেস  
চাচা জ্বর-ঠান্ডার এটা সেটা ওষুধ এনে খাইয়েছেন  
কয়দিন। এ সময় গোপনে বাঘারপাড়া থেকে তার  
বোন এসে তাকে দেখে গেছে রাতের অন্ধকারে।  
পাশের গ্রামে ওর নানাবাড়ি।

নানা-নানি আর দুই মামাও দেখে গেছে। এত কিছু  
হচ্ছে, সবই গ্রামের মানুষের- বিশেষ করে কিশোর  
বাহিনীর অজান্তে। গ্রামে যেখানে সামান্য একটা কিছু  
ঘটলেই রাতারাতি সবাই জেনে যায়, সেখানে  
ফরিদের এত বড়ো একটা ঘটনা কীভাবে এতটা দিন  
গোপন থাকল, তা এক অবাক কাণ্ডই বটে! আমি  
তখনই ফোন করি উপজেলা নিবাহী অফিসারের  
কাছে এবং উপজেলা হাসপাতালে। থানার ওসিকেও  
জানাই। ঘটনাখানেকের মধ্যে পুলিশ এসে ফরিদের  
বাড়িতে লাল পতাকা উড়িয়ে দিল অর্থাৎ বাড়িটি  
লকডাউন করা হলো। এখন বাইরের থেকে কেউ এ  
বাড়িতে ঢুকতে পারবে না; খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া  
এ বাড়িরও কেউ বাইরে যেতে পারবে না, আর  
বাইরে যে যাবে তাকে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে  
হবে। শুধু এই নয়, ফরিদের বোনের বাড়ি এবং  
নানাবাড়িও লকডাউন করা হলো। টানা চৌদ্দ দিন  
তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।  
এরমধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা না গেলে তো বাঁচা;  
আর দেখা গেলে ফরিদকে নিয়ে যে হাস্যামা হচ্ছে,  
তাদেরকে নিয়েও তাই হবে।

এদিকে হাসপাতাল থেকে ডাক্তার এলেন, সাথে  
কয়েকজন সহকারী। কিছুক্ষণ পর উপজেলা নিবাহী  
অফিসারও এলেন কয়েকজন কর্মকর্তা ও

কর্মচারীসহ। থানার ওসি এলেন। সবারই মাস্ক  
পর। কারও কারও হাতে গ্লাভসও আছে। বঙ্গবন্ধু  
কিশোর বাহিনীর কেস বলে এ নিয়ে রীতিমতো  
হইচই পড়ে গেল চারদিকে। হারেস চাচা তো ভয়ে  
জড়োসড়ো। ঘটনা গোপন করার জন্য তার কোনো  
শান্তি হয় কিনা সে এক চিন্তা, অন্যদিকে অসুস্থ  
ফরিদের চিন্তা- চাচা একেবারে ভেঙে পড়েছেন।  
আমি তার অবস্থা দেখে তাকে শান্ত থাকতে বলি।

সবার সাথে আলোচনা করে আমার প্রস্তাব মতো  
সিদ্ধান্ত হলো- বাড়িতেই ফরিদের চিকিৎসা চলবে,  
তবে তাকে আলাদা ঘরে থাকতে হবে। সমস্ত  
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। আমরা উপজেলা  
নিবাহী অফিসার ও হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবকে  
আশ্বস্ত করলাম যে, আমাদের ট্রেইন্ড ছেলেমেয়েরা  
সবসময় নজর রাখবে যাতে স্বাস্থ্যবিধি কোনোভাবেই  
লঙ্ঘন না হয়। ওসি সাহেব ঘোষণা দিলেন এই বাড়ি,  
ফরিদের বোনের বাড়ি আর নানাবাড়ি পুলিশের  
বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে, যাতে কোনোভাবেই  
কেউ স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করতে না পারে। আর থানার  
সব জায়গায় তো পুলিশি নজরদারি আছেই।

উপজেলা হাসপাতালের ডাক্তারের নেতৃত্বে  
স্বাস্থ্যকর্মীরা ফরিদের প্রাজমা সংগ্রহ করলেন।  
আপাতত চিকিৎসার জন্য ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে  
দিলেন। কিছু জরুরি ওষুধ তিনি নিয়ে এসেছিলেন,  
তখনই তা খাওয়ানো শুরু হলো। সবাই বিদায় নিয়ে  
চলে গেলেও হারেস চাচা এখনো জড়োসড়ো,  
ভীতসন্ত্রস্ত। আমার কাছে তার ব্যাকুল প্রশ্ন- ফরিদ  
বাঁচবে তো! আমার একদম ভালো ঠেকতিছে না  
বাজান। আমি চাচাকে ধামিয়ে দিয়ে বলি- ভেঙে  
পড়লে চলবে না চাচা। মনে রাখবেন- আমাদের  
এটাও এক যুদ্ধ। এ সময় চাই মনোবল আর কঠোর  
সাবধানতা। ফরিদের যদি করোনা পজেটিভ রিপোর্ট  
আসেও, তবুও ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে হবে।  
একচুল অসাবধান হওয়া চলবে না। ফরিদ যে ঘরে  
আছে সেখানেই থাকুক। আপনাদের তো আরো দুটো  
ঘর আছে, কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। টয়লেট  
অবশ্য একটা। তা হোক, সেটাকে সবসময় পরিষ্কার  
রাখতে হবে। ফরিদকে যে বা যারা  
খাবারদাবার-ওষুধপত্র দেবে বা দেখাশোনা করবে,  
সবাইকেই তখন মাস্ক পরতে হবে। অন্তত তিন ফুট



দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাবান পানি দিয়ে হাত ভালোভাবে না ধুয়ে সেই হাত দিয়ে নাক-মুখ-চোখ বা অন্য কোনো জিনিস স্পর্শ করা যাবে না। কোনো ময়লা কাপড় ঘরে থাকবে না। এমনি কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারলে ফরিদও সুস্থ হয়ে উঠবে আর তার থেকে অন্য কেউ আক্রান্ত হবে না বলে আশা করা যায়।

পরদিন ডাক্তার এলেন। দুয়েক দিনের মধ্যেই ফরিদের রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে তিনি জানালেন।

ফরিদের জন্য যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মানা হচ্ছে দেখে ডাক্তার ভারি খুশি হলেন। আমাদের সদস্যদের পরামর্শ আর সযত্ন নজরদারির কারণেই এতটা সাবধানতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে বলে ডাক্তারের অকপট স্বীকারোক্তি; এজন্য তিনি আমাকে ও আমার সদস্য বন্ধুদের ধন্যবাদও জানালেন।

ডাক্তার সাহেব ও তার সহকারীরা চলে যাওয়ার পর আমরা বাইরে আমতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এ সময় দেখি দুটো ছেলে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তাদের একজন মাঝারি স্বাস্থ্যের, অন্যজন চিকন কাঠির মতো লম্বা। ওদের বয়স আমার চেয়ে বেশ কমই হবে। পাশের গ্রামে বাড়ি। হয়ত কোনো কাজে এদিকে এসেছিল। কিন্তু তাদের মুখে মাস্ক নেই। দুজনেরই হাতে টাউস সাইজের মোবাইল ফোন।

বেশ হাসিতামাশা করতে করতেই যাচ্ছে। চারদিকে যে করোনার আতঙ্ক এবং সামান্য দূরের বাড়িতেই যে করোনা সন্দেহের একটা রোগী রয়েছে, তা যেন তাদের হিসাবেই নেই। আমার ভীষণ রাগ হলো ছেলে দুটোর ওপর। আমি হাত ইশারায় ওদেরকে ডাকলাম। ওরা তা গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে যেতে থাকে। তখন কিশোর বাহিনীর গাটাগোটা দুই সদস্য হিমেল আর তরুণ একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের ডাক দেয়। এবার ওরা এগিয়ে আসে আস্তে আস্তে। ওদের ভাব দেখে আমি রাগে ফুঁসছি, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করি না। বলি- ভাইভিরা, বাড়ি কনে?

- রামকান্তপুর।

- গিছিলে কনে?

- এই গিরামেই- দক্ষিণ পাড়ায়।

- মুখে মাস্ক নেই কেন?- এবার আমি একটু চড়াগলায় জিজ্ঞেস করি। ছেলে দুটি এবার ভড়কে যায়। মাথা নীচু করে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। আমি আবার শক্তকণ্ঠে বলি: এখন করোনাকাল, তা জানো তোমরা?

- জে, জানি।

- তাহলে মাস্ক পরোনি কেন? এ সময় বাইরে বেরোতে হলে মাস্ক পরতে হয়, জানো না?

- জে, জানি ছার। ভুল হয়ে গেছে।  
- এমন ভুল আর করবা?  
- জে না, ছার- বলেই ওরা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। তখনই দেখি তিনজন টহল পুলিশ এদিকে আসছে। ওরা সবাই আমাদের চেনা। আমি তাদেরকে সব খুলে বলি। পুলিশ দেখে ছেলে দুটো ভয়ে একেবারে কঁকড়ে যায়। এক পুলিশ চাচা তা দেখে বলেন- তোমরা আসলে তো ভীতুর ডিম; এই সাহস নিয়ে করোনার মধ্যে মাস্ক না পরে রাস্তায় বের হয়েছে! এরা আছে বলে বেঁচে গেলে, নাহলে তো উত্তমমধ্যম না দিয়ে ছাড়তাম না। যাও, ভাগো! মাস্ক না পরে আর কখনো বাইরে বের হবে না, মনে থাকবে?

- জে, ছার- বলতে বলতে ছেলে দুটো জোরে হাঁটা দেয় উত্তর দিকে। এ সময় হঠাৎ অল্পবয়স্ক একটি ছেলে হাউমাউ করতে করতে আমার কাছে আসে। ছেলেটিকে আমরা চিনি না। দূরের গ্রাম থেকে এসেছে কি? আমি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করি- তুমি কোথা থেকে এসেছে? কী হয়েছে বলা।

- আমার দাদি...

- কী হয়েছে তোমার দাদির?

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে যা বলল, তা সোজা করলে এই দাঁড়ায়: তার বাড়ি শেখেরবাথান গ্রামে। তাদের পাশের বাড়ির একজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গতকাল থেকে তার বুড়ো দাদিরও জ্বর, সর্দিকাশি, মাথাব্যথা। তাই করোনার ভয়ে তার বাবা-মা ওই বুড়ো মানুষটাকে একা ঘরে রেখেই দু-গ্রাম পরে তার নানাবাড়ি ভন্দরডাঙ্গায় চলে গেছে। সে পরে যাবে বলে ছুটে এসেছে বঙ্গবন্ধু কিশোর বাহিনীর কাছে। কারণ, সে শুনছে কিশোর বাহিনীর কাছে খবর গেলে আর কোনো চিন্তা নেই- তারাই সব ব্যবস্থা করবে।

আমি পুলিশ চাচাদের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারি, তারা সেখানে যেতে প্রস্তুত। আমাদের কিছু ভ্যানওয়ালা আছে, আমরা ফোন দিলেই যারা ছুটে আসে। এমন একজন হলো বিশ্বজিৎ। সে আমাদের গ্রামেরই ছেলে। আমি তাকে ফোন করি। ফোন পাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই হালকা নীল রঙের চমৎকার মাস্ক পরা বিশ্বজিৎ হাজির। দুজন পুলিশ আর ছেলেটি উঠল ভ্যানে, সে বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

কথা হলো- দুই পুলিশ চাচা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাবধানতার সাথে বৃদ্ধাকে উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। এর আগে আমি হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির বিষয়টি পাকাপোক্ত করে রাখব। উপজেলা নিবাহী অফিসার আর থানার ওসিকেও বিষয়টি জানাবো। পরবর্তীতে বৃদ্ধার পাশে ছেলেটিকে কীভাবে শান্তি দেওয়া যায়, সে বিষয়টিও মাথায় থাকল আমার।

বন্ধুরা, অসহায় বৃদ্ধাকে নিয়ে আমাদের উদ্বেগ ও আন্তরিকতারই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। সব খুঁটিনাটি বলার সময় এখন নয়। তবে শুনো খুশি হবে যে, ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় বৃদ্ধার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আশা করি, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ভালো হয়ে যাবেন। হয়েছিলও তাই। ওদিকে ওসি সাহেব বৃদ্ধার ছেলেকে থানায় ডেকে এনে এমন ধমক দিয়েছেন যে, তার করোনার ভয় কোথায় পালিয়েছে! সে হাসপাতালে এসে মায়ের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আর বারবার মাফ চেয়েছে। সে ওয়াদা করেছে- কোনোদিন সে আর মায়ের সাথে এমন নির্দয় আচরণ করবে না। তবে এসব গল্প আরো বেশ পরের- আগেই বলে দিলাম বন্ধুরা, পরে আর সময় হবে না বলে। এখন চলো আমার পুরনো বন্ধু ফরিদের হালনাগাদ খবর জানি।

ডাক্তারের দেওয়া ওষুধপত্র সেবন ও ভালো-ভালো খাবার খেয়ে দু-তিনদিনের মধ্যেই ফরিদ বেশ চাঙা হয়ে ওঠে। আর স্বাস্থ্যবিধি? একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সব নিয়ম মানা হচ্ছে। আমাদের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকায় একচুলও ভুল হওয়ার উপায় নেই। তাছাড়া প্রতিদিন ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মীরা আসছেন। এত কড়াকড়ির মধ্যে বেচারার করোনা ভাইরাসের পলাই-পলাই অবস্থা হয়েছে কিনা কে জানে!

ফরিদের ল্যাব. রিপোর্ট এসেছে, তার করোনা পজিটিভ। ডাক্তার সাহেব নিজেই এসেছেন রিপোর্ট নিয়ে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় ওষুধও। ডাক্তার সাহেবের- আগের মতোই বিশেষ পোশাক পরা। তিনি ফরিদকে পরীক্ষা করে বললেন- সবকিছু ঠিকভাবেই এগোচ্ছে। আশা করি, খুব শিগগির ফরিদ করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে সবার উদ্বেগ দূর করবে।

ডাক্তার সাহেবের কথাই সত্য হলো। ফরিদ কিছুদিন পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল এবং বঙ্গবন্ধু কিশোর বাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদের সাথে করোনা যুদ্ধে নেমে পড়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ও যখন চমৎকার করে হাসে, তখন আমার কী যে ভালো লাগে! তখন আমার মনে হয়— আমরা একান্তরের যুদ্ধজয়ী জাতি। একসাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহস আর প্রেরণার উত্তরাধিকারী আমরা; আর সেই সাহস—প্রেরণার মশালবাহী তাঁর কন্যা

শেখ হাসিনা রয়েছেন আমাদের সাথে। এই করোনাও একদিন পরাজিত হবে আমাদের কাছে। আমরা একদিন তাকে জয় করবই এবং আবার ঘরে ঘরে মুক্ত স্বাধীন খুশির হাওয়া দোলা দিয়ে যাবে। আমরা সবাই সেদিন বইখাতা নিয়ে নির্ভয়ে স্কুলে যাব। হাসব খেলব গাইব।

করোনা জয়ী ফরিদের দিকে আমি যতবার তাকাই, ততবারই মনে হয়: আমরা পারব— আমরা পারবই এই ভয়াবহ যুদ্ধে জয়ী হতে। ■

লেখক পরিচিতি: শিশু সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক

## সাড়ে তিনশো বছর আগের লকডাউন

শাহানা আফরোজ

করোনা ভাইরাসের কারণে সারাবিশ্ব ঘরবন্দি থাকার অর্থ বুঝেছে। এমন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হলে কীভাবে নিজেকে বন্দি রেখে কিংবা অন্যদের থেকে দূরত্ব গড়ে তুলে সুস্থ থাকা যায় এবং অন্যদের সুস্থ রাখা যায় তা শিখিয়েছে এই মহামারি। এছাড়া আমরা অনেক নতুন শব্দও জেনেছি। লকডাউন ও কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন। কিন্তু বন্ধুরা তোমরা কি জানো প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগেও লকডাউন হয়েছিল একটি গ্রামে, ছিল কোয়ারেন্টাইনও।

ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ারের ইয়াম নামের একটি ছোট্ট গ্রাম সারাবিশ্বের কাছে লকডাউনের অর্থ শিখিয়ে দিয়েছিল। মহামারি প্রেগের সংক্রমণ রুখতে নিজেদের ঘরবন্দি করে ফেলেছিল গোটা গ্রাম। বাইরের জগতের সঙ্গে রাতারাতিই যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল তারা। ওই ঘটনার পর থেকে এই গ্রামের নাম বিশ্বের দরবারে হয়ে উঠেছিল 'প্রেগ গ্রাম'। দ্রুত মহামারিকে পরাজিত করার জন্য এই গ্রাম এখনও পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের জায়গা।

১৬৬৫ সালে মহামারির কবলে পড়েছিল ইয়াম। পিক জেলা জাতীয় উদ্যানের মধ্যেই রয়েছে গ্রামটি। অরণ্যের মধ্যে গ্রাম হওয়ায় এর জনসংখ্যা

তুলনামূলকভাবে কমই। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী সেখানে জনসংখ্যা মাত্র ৯৬৯ জন। সে সময় গ্রামের এক দর্জি জর্জ ভিকারস লন্ডন থেকে অনেক কাপড় নিয়ে এসেছিলেন। সেই কাপড়ের সঙ্গেই গ্রামে ঢুকে পড়েছিল প্রেগের জীবাণু। এক সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যু শুরু হয় গ্রামে। প্রথম মারা যান ওই দর্জিই। তারপর তার পরিবারের অনেকে এবং তার গ্রাহকদের অনেকেই।

গ্রামপ্রধানের বুঝতে অসুবিধা হয়নি প্রেগ-এ আক্রান্ত হয়েছে তার গ্রাম। বিশ্বব্যাপী প্রেগ যে ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে সে খবর তার জানা ছিল। তাই তিনি আর দেরি করেননি। গোটা ইয়াম গ্রামকে পুরোপুরি আলাদা করে ফেলেছিল। গ্রামের কোনোও লোকজনই নিজের বাড়ি থেকে বের হতেন না। পাশের গ্রামগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল ইয়ামের গ্রামপ্রধান। রাতারাতি কড়া লকডাউন ঘোষণা করেন। তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল গ্রামবাসীরা আর খুব শিগগিরই গ্রামটি প্রেগ মুক্ত হয়েছিল।

**[ছোট্ট বন্ধুরা এখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। তাই তোমরা সাবধান থাকবে। ঘরের বাইরে মাস্ক পরবে।]**





## মজাদার আইসক্রিম কোন আহমেদ রিয়াজ

কোন আইসক্রিম মানে কোনাকৃতির আইসক্রিম! কোনাকৃতি বিস্কুটের ভিতরে আইসক্রিম। কখনো কখনো এই কোন আইসক্রিমের মধ্যে চকোলেট, বাদাম কিংবা আরো কিছু উপাদান দেওয়া থাকে। আইসক্রিমও থাকে নানান গন্ধের, নানান স্বাদের। কোন আইসক্রিমের কথা শুনে অনেকেরই জিহ্বা এতক্ষণে পানিতে ভরে উঠেছে। এত মজাদার কোন আইসক্রিম আবিষ্কার কিছ্র পরিকল্পনা করে হয়নি। হঠাৎ করে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে মজার এক গল্প।

যদিও কোন আইসক্রিম আবিষ্কারের দাবিদার অনেকেই। তবে দুজনের নাম বেশি জানা যায়। প্রথমজনের নাম ইটালো মারচিওনি। মারচিওনি ভদ্রলোক ইতালি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন আঠারো শতকের শেষের দিকে। ১৮৯৬ সালের আগ পর্যন্ত কোন আইসক্রিমের মতো কিছু একটা উদ্ভাবনের পিছনে লেগে ছিলেন মারচিওনি। নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিটে একটি ঠেলাগাড়িতে তিনি বিক্রি করতেন ঘরে তৈরি আইসক্রিম। ঘরে তৈরি এই আইসক্রিম পরিচিত ছিল লেমন আইস নামে। এটা ছিল ইতালির একটি জনপ্রিয় রেসিপি। ক্রেতাদের স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে আইসক্রিম পরিবেশন করতেন মারচিওনি। এই কাচের গ্লাসকে বলা হয় লিকার গ্লাস। তবে লিকার গ্লাসে আইসক্রিম বিক্রি নিয়ে বামেলার কমতি ছিল না। ক্রেতার হাত থেকে পড়ে কখনো গ্লাস ভেঙে যেত। আবার কখনো ক্রেতার কাছেই রয়ে যেত।



প্রতিদিন গ্লাস খোয়া যেত। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হতো। এ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটা উপায় বের করলেন মারচিওনি। এক ধরনের মুচমুচে কেক তৈরি করলেন। মুচমুচে এই কেকের নাম ওয়াফল। কাপের আকারের ওয়াফলের ভিতরে আইসক্রিম পরিবেশন শুরু করলেন তিনি। এবার আর গ্লাসের দিকে নজর দিতে হলো না। ওদিকে ক্রেতারাও আইসক্রিম খাওয়ার পর মুচমুচে কেকের স্বাদও নেওয়ার সুযোগ পেলেন। ব্যস। তাতেই বাজিমাত করে ফেললেন মারচিওনি। পুরো ওয়াল স্ট্রিটে আইসক্রিম বিক্রেতা হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। তার আইসক্রিম এতই বিক্রি

হতে লাগল যে, একা ক্রেতার ভিড় সামলাতে পারলেন না। অল্প কয়েকদিনেই আরো ৪/৫টা ঠেলাগাড়িতে আইসক্রিম বিক্রি শুরু করতে হলো তাকে। ১৯০৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর চমৎকার এই আবিষ্কারটাকে নিজের নামে প্যাটেন্ট করে নেন ইটালো মারচিওনি।

মূলত ওই সময়টা ছিল নানান উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সময়। ওই সময় এমনও হয়েছে, দুনিয়ার দু'জায়গায় দুজন মানুষ একই আবিষ্কার করে বসে আছেন। যেমনটা ঘটেছিল বেতার আবিষ্কারের বেলায়।

যাই হোক, তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। যে কারণে কে কখন কোথায় কী যে আবিষ্কার করেছেন, তা জানার সুযোগ ছিল খুবই কম। জানাজানি হতেও কয়েক বছর পেরিয়ে যেত। আর সে কারণে মারচিওনি কোন আইসক্রিম আবিষ্কারের ছয় বছর পরে আরেকজন কোন আইসক্রিম আবিষ্কারের দাবি করেছিলেন। এই আবিষ্কারকের নাম আর্নেস্ট এ হামভি। তিনিও যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী ছিলেন। তিনি এসেছিলেন সিরিয়া থেকে। হামভি সাহেবও ছিলেন আইসক্রিম বিক্রেতা। তবে পেস্ট্রি বানানোয় ওস্তাদ ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তখন ওয়াফল ছিল জনপ্রিয় খাবার। ওয়াফল হচ্ছে এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার। বিস্কুটও নয়, আবার মিষ্টিও নয়। তাহলে কেমন? অনেকটা পেস্ট্রির মতো। আর সঠিকভাবে বলতে গেলে, কোন আইসক্রিমের আইসক্রিমটা যে কোনাকৃতির বিস্কুটের ভিতরে থাকে, ওয়াফল খেতে অনেকটা ওই বিস্কুটের মতো।

১৯০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির সেন্ট লুইস নামক জায়গায় জমকালো বিশ্ব মেলা হচ্ছিল। এই বিশ্ব মেলায় অংশ নিলেন হামভি। মেলায় ক্রেতাদের নতুন কিছু দিতে চাইলেন হামভি। ভাবতে লাগলেন নতুন কী নিয়ে চমকে দেবেন সবাইকে। আর ভাবতে ভাবতেই পেয়ে গেলেন নতুন একটি খাবার। ওয়াফলকে কোনের মতো আকার দিয়ে তার ভিতরে আইসক্রিম ভরে বিক্রি করতে শুরু করলেন হামভি সাহেব। ব্যস! অমনি হইচই পড়ে গেল মেলায়। নতুন ধরনের আইসক্রিমের টানে দলে দলে মানুষ ছুটে এল হামভি সাহেবের দোকানে।

মেলার পর করনোকপিয়া ওয়াফল কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে বসলেন হামভি। কোন আইসক্রিম জনপ্রিয় করার জন্য ঘুরে বেড়ালেন নানা জায়গায়। প্রায় পাঁচ হাজার কোন আইসক্রিম বিনা পয়সায় বিলি করলেন এ সময়। তারপর ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন মিসৌরি কোন কোম্পানি।

তারপর সেই থেকে শুরু হলো কোন আইসক্রিমের জয়জয়কার। দুনিয়া জয় করে ফেলল কোন আইসক্রিম। ১৯২০ সালের মধ্যেই কোন আইসক্রিমের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইসক্রিম বিক্রি হয়েছিল প্রায় আড়াই কোটি।

আর এখন? দুনিয়া জুড়ে কত কোটি কোন আইসক্রিম যে বিক্রি হচ্ছে-সব হিসাব করাও সম্ভব নয়। অত হিসাব করার কি দরকার? তারচেয়ে বরং হয়ে যাক একটা কোন আইসক্রিম... ■

লেখক পরিচিতি: শিশু সাহিত্যিক





'কাচ' শব্দের অর্থ- সাজ, বেশভূষা; ছল, লীলাখেলা, নাচ-তামাশা এসব! কী, খটকা লাগলো 'কাচ' শব্দের এমন অর্থ শুনে? লাগবেই তো। আমরা জানি 'কাচ' মানে স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর ব্যবহার্য বস্তু বিশেষ। একে ইংরেজিতে বলে glass। এই 'কাচ' দিয়ে আয়না, বোয়াম কত কী-ই না বানানো হয়। আর এখন বলছি— সাজ, বেশভূষা; ছল, লীলাখেলা, নাচ-তামাশা! আর তাই খটকা তো লাগবেই!

হ্যাঁ, একই শব্দের এমন বহু অর্থবোধ থাকতে পারে। এই বহু অর্থবোধই ভাষায় শব্দের একটি খেলা। অর্থের এমন ভিন্নতা ওই শব্দটির গঠন উৎপত্তিতে হয়ে থাকে। এসব শব্দ অর্থের দিক থেকে কোনোটি বহুল প্রচলিত; আবার কোনোটি একদমই অচেনা। আমাদের বাংলা ভাষাতেও একই শব্দের ভিন্ন অর্থ আমাদেরকে কখনো কখনো খটকা লাগিয়ে দেয়। আজ তেমনই একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করব। শব্দটি হলো 'কাচ'।

আমাদের অতি চেনা 'কাচ' শব্দটির তিনটি অর্থ—  
১. স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর ব্যবহার্য বস্তুবিশেষ

২. সাজ, বেশভূষা ইত্যাদি

৩. ছল, লীলাখেলা, নাচ-তামাশা ইত্যাদি।

এর মধ্যে প্রথমটির বিকল্প বানান 'কাঁচ'। চন্দ্রবিন্দু (°) ব্যবহৃত এই 'কাচ' বানানটি আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। আভিধানিকভাবে ও উৎপত্তিগতভাবে শুদ্ধতর বানান 'কাচ'; তবে 'কাঁচ' অশুদ্ধ নয়। ২য় ও ৩য় অর্থবোধে 'কাচ' শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত। তাই সাজ, বেশভূষা, ছল, নাচ-তামাশা ইত্যাদি অর্থে 'কাচ' শব্দের ব্যবহার অচেনা লাগবে, খটকা লাগবে। মধ্যযুগের সাহিত্যে অবশ্য কিছু কিছু ব্যবহার দেখা যায়।

অর্থের এই ভিন্নতা কিন্তু 'কাচ' শব্দটির উৎপত্তিগত ধারা থেকেই এসেছে। তিনটি শব্দই তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। তবে সংস্কৃত হলেও উৎপত্তিগত ধারা ভিন্ন ভিন্ন বলেই হয়ত শব্দটির অর্থ বদলে গেছে।

স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর বস্তু অর্থে 'কাচ' শব্দটি সংস্কৃত  $\sqrt{\text{কচ্}}$  ধাতুর সাথে অ(ঘঞ) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে।

সংস্কৃত মূল প্রত্যয় 'ঘঞ'। এটি 'অনুবন্ধ ধ্বনিজাত' প্রত্যয়। 'অ' প্রত্যয়ের সাথে বাড়তি দুটি ধ্বনি 'ঘ', 'ঞ' যুক্ত করে প্রত্যয়টি গঠন করা হলো- ঘ+অ+ঞ= ঘঞ। অতঃপর শব্দ গঠনের সময় এই বাড়তি 'ঘ', 'ঞ' বাদ গিয়ে শুধু 'অ' ধ্বনিটি ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। প্রত্যয় গঠনের সময় এমন বাড়তি ধ্বনি যোগ করাকে বলে 'অনুবন্ধ' আর শব্দ গঠনের সময় আবার সেই বাড়তি ধ্বনি বাদ দেওয়াকে বলে 'ইৎ'। এমনটি হয় ধ্বনিগত নানাবিদ কারণে। তাই  $\sqrt{\text{কচ}} + \text{অ(ঘঞ)} = \text{'কচ'}$  হওয়ার কথা। কিন্তু 'কাচ' হলো যে! ব্যাপারটা আবারো খটকা লাগার মতো। কিন্তু না, খটকা নয়; এখানেও গঠনগত আরেকটি ধারা যুক্ত হয়েছে। সে ধারা হলো প্রত্যয়ের 'গুণ ও বৃদ্ধি'।

'গুণ ও বৃদ্ধি' হলো প্রত্যয়ে অবস্থিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়ে শব্দ গঠনে ব্যবহার উপযোগী হওয়া। যেমন- অ,আ পরিবর্তন হয়ে 'আ'; ই,ঐ পরিবর্তন হয়ে 'ঐ'; উ,ঊ পরিবর্তন হয়ে 'ঊ'; ঋ পরিবর্তন হয়ে 'আর্'; এ পরিবর্তন হয়ে 'ঐ'; ও পরিবর্তন হয়ে 'ঔ' হয়। এগুলো হলো বৃদ্ধি। আবার ই, ঐ পরিবর্তন হয়ে 'এ'; উ, ঊ পরিবর্তন হয়ে 'ও'; ঋ পরিবর্তন হয়ে 'অর্' হয়। এগুলো হলো গুণ। এসব 'ও' হলো প্রত্যয়ের ধ্বনিগত একটি ধারা।

এখানে  $\sqrt{\text{কচ}}$  ধাতুর সাথে যুক্ত 'অ' প্রত্যয়ের 'বৃদ্ধি' ঘটেছে। তাই এটি 'আ' হয়ে 'কাচ' হয়েছে। এভাবেই ১ম 'কাচ' শব্দটি প্রত্যয় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

২য় 'কাচ' শব্দটির অর্থ সাজ, বেশভূষা ইত্যাদি। এই 'কাচ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এলেও এর উৎপত্তি আরেকটি ধারা। সংস্কৃত দুটি শব্দ 'কাট' ও 'কক্ষ' থেকে এসেছে। 'কাট' শব্দ প্রাকৃত ভাষায় 'কজ্জ' হয়ে বাংলা ভাষায় 'কাচ' হিসেবে প্রবেশ করেছে। আবার 'কক্ষ' শব্দ প্রাকৃত ভাষায় 'কচ্ছ' হয়ে বাংলা ভাষায় 'কাচ' হিসেবে প্রবেশ করেছে।

'প্রাকৃত' হলো বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী রূপ। 'কজ্জ' শব্দের ভাবগত অর্থ প্রকাশ করে 'কাজলের সাজ'। 'কচ্ছ' শব্দের ভাবগত অর্থ পরিধান করা, পোশাক কাচা, মারা। এসব অর্থবোধ থেকেই 'কাচ' শব্দের

একটি অর্থ দাঁড়িয়েছে সাজ, বেশভূষা ইত্যাদি। তবে এসব সাজ, বেশভূষা মূলত অভিনয়ের সাজ, বেশভূষাকেই বুঝায়।

৩য় 'কাচ' শব্দটির অর্থ ছল, লীলাখেলা, অভিনয়, নাচ-তামাশা ইত্যাদি। এই 'কাচ' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'কার্য' থেকে। সংস্কৃত 'কার্য' প্রাকৃত ভাষায় 'কজ্জ' হয়ে বাংলা ভাষায় 'কাচ' হিসেবে প্রবেশ করেছে। 'কার্য' অর্থ আমরা জানি কাজ, কর্ম ইত্যাদি। 'কজ্জ' এখানে ভাবগতভাবে কাজের ভাবই প্রকাশ করে। ছল, লীলাখেলা, অভিনয়, নাচ-তামাশা এসবও এক প্রকার কাজ। তাই কাজের এমন অর্থ প্রকাশ করতেই 'কাচ' শব্দের উৎপত্তি।

কী বন্ধুরা, পেলে শব্দ তিনটির খটকা লাগা অর্থের সহজ সমাধান? গঠনগত কারণে একই শব্দ 'কাচ' ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অর্থে বাংলা ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। তারপরও মনে রাখতে হবে 'প্রচলিত' আর 'অপ্রচলিত' শব্দ দুটির উপর। 'কাচ' শব্দটির তিনটি অর্থ হলেও প্রচলিত ১ম 'কাচ' স্বচ্ছ ও ভঙ্গুর বস্তু হিসেবেই কাচ (glass) শব্দের মূল ব্যবহার। আর অপর দুটি অর্থে 'কাচ' শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত। মধ্যযুগের কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'বেশভূষা' অর্থে তার মঙ্গলকাব্যে ব্যবহার করেছেন- 'ভুবনমোহন কাচে, রত্নমালাতথি নাচে'। বাংলা প্রবাদে 'কাচ'-এর ৩য় অর্থের ব্যবহার পাওয়া যায়- 'বুড়া বয়সে ধেড়ে কাচ'।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর-এর কথপোকথনে গণিত শেখা জাতীয় গ্রন্থ 'লীলাবর্তী'তে পাওয়া যায় 'ছল' অর্থে 'কাচ' শব্দের ব্যবহার; যা পরবর্তীতে বাংলা প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত হয়। এখানে বুড়ো কোনো একজনকে দেখে ছলের আশ্রয় নিয়েছে- এমন অর্থ প্রকাশ করেছে। পুরো বাক্যটা এমন- 'তবু তারে দেখে-বুড়ো বয়সে ধেরে কাচ-সেকেন্দারী গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও'।

দেখলে শব্দের খেলা কত মজার! একই বানানে খটকা লাগলেও তুমি জেনে যখন ঘাড় মটকালে; খটকাটা কেমন কেটে গেল! দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভয়ও দূর হলো। ■

লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক



ছোটদের গল্প

## মুক্তিসেনা

এম এম জাকারিয়া জামি

আকাশ এবং সাগর দুই ভাই। আকাশ পড়ে সগুম শ্রেণিতে এবং সাগর পড়ে ওয় শ্রেণিতে। মাসটা ডিসেম্বর। কিছুদিন পরই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। এই বিজয় দিবস নিয়ে আকাশ ও সাগরের মনে খুবই কৌতূহল। তারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প শুনতে চায়। তারা বসবাস করত ঢাকার একটি স্বনামধন্য এলাকায়। একটি ভাড়া বাসায় তাদের বাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, আকাশ ও সাগর তাকে দাদু বলেই ডাকত। বৃদ্ধ ব্যক্তির নাম ছিল আশরাফ সাহেব। তার বড়ো ছেলে ছিল মুক্তিযোদ্ধা। যদিও যুদ্ধে গিয়ে সে আর ফেরত আসেনি। আকাশ ও সাগর বিষয়টি জানত। তাই তারা আশরাফ সাহেবের কাছে গিয়েছিল তার বড়ো ছেলের যুদ্ধের সাহসিকতার কথা শুনতে। তাদের জোরাজুরিতে আশরাফ সাহেবও তাদের বলতে শুরু করলেন।

আশরাফ সাহেব ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। চাকরির সুবাদে তাকে ঢাকায়ই থাকতে হতো। তিনি এবং তার দুই ছেলে ও স্ত্রীসহ ঢাকায় থাকতেন। তার বড়ো ছেলে শৈবাল ও ছোটো ছেলে শৈলব। শৈবাল এর বয়স ছিল ১৭ বছর আর শৈলব এর বয়স ছিল ১২ বছর। দেশের অবস্থা তখন খুব একটা ভালো না। সময়টা ছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। জায়গায় জায়গায় মিলিটারি ক্যাম্প। কিছুদিন আগেই ঢাকায় গুলিবর্ষণ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আশরাফ

সাহেব চিন্তিত হয়ে তার সন্তান ও স্ত্রীকে তার শ্বশুরবাড়ি চাঁদপুর দিয়ে আসেন। গ্রামে তাঁর শ্বশুরবাড়ির সবাই আছেন। তাই তিনি সেখানে তার পরিবারকে নিশ্চিন্তে রেখে প্রশ্নগুলো কাকে করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। শৈবালের নানা ছিলেন রসিক মানুষ। শৈবাল প্রায়ই সকালে নানার সাথে ঘুরতে বের হতো। নানার সাথে শৈবাল ও শৈলবের ভালোই জমত। বিকাল হলে শৈবাল তার মামার সাথে ঘুরত। শৈলব বাড়ি থেকে তেমন একটা বের হতো না। দিন শেষে রাতে তারা সকলে একসাথে রেডিওতে খবর শুনত।

তখন প্রায়ই রেডিওতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ শোনানো হতো। শৈবাল এই ভাষণ মন দিয়ে শুনত। তার নানা ও মামার সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করত। তার নানা তার এসব কথায় চিন্তিত হয়ে পড়ত, শৈবালের কথায় সে বিদ্রোহের আভাস পেত। আশরাফ সাহেব প্রতি সপ্তাহেই গ্রামে আসতেন। এসে তাদের খোঁজখবর নিতেন। একদিন আশরাফ সাহেবের গ্রামে আসার কথা ছিল কিন্তু সেদিন ঢাকায় কী যেন একটা গণ্ডগোল হলো সে আর গ্রামে আসতে পারলেন না। এতে শৈবালের মাথায় নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। শৈবালের মামাও ছিল বিদ্রোহী। শৈবালের এই বিদ্রোহী ভাবটা মূলত তার মামার কাছ থেকেই পেয়েছে। শৈবালের মামা তার খুবই প্রিয় ছিল, সেজন্য শৈবাল মামার

সাথে প্রায় সময়ই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করত। এরই মাঝে মিলিটারি বাহিনী শহরের পর গ্রামেও আক্রমণ শুরু করেছে তবে তাদের গ্রামে নয়। কয়েক গ্রাম পরের গ্রামে। গ্রামে মুক্তিবাহিনী গঠন শুরু হলো। হঠাৎ এরই মাঝে শৈবালের মামা উধাও হয়ে গেল। শৈবালের নানা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন শৈবালের মামা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। আশরাফ সাহেব দু'দিন পরই স্ত্রী ও সন্তানদের ফেরত নিতে আসবেন। দিনটি ছিল সোমবার। হঠাৎ সেদিন মাঝরাতে শৈবালের নানা বাড়িতে কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। শৈবালের নানা দরজা খুলে দেখলেন শৈবালের মামার বন্ধু বিনু ও নিতাই। তারাও শৈবালের মামার সঙ্গে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। শৈবালের মামাই তাদের পাঠিয়েছে, বাড়ির খোঁজখবর জানতে। মাঝরাতেই তাদের জন্য খাবার রান্না করা হলো। কোনোমতে দু'মুঠো ভাত তাদের খেতে দেওয়া হলো। কেউ যেন টের না পায় তাই রাতেই তাদের বিদায় দেওয়া হবে। শৈবালেরও ইচ্ছা হচ্ছিল তাদের সাথে যাবে কিন্তু বলার সাহস হচ্ছিল না।

বিনু ও নিতাই এবার বিদায় নেবে। শৈবালের নানা তাদের কাছে কিছু চিড়া ও মুড়ি দিয়ে দিলো পথে যাওয়ার জন্য। তাদের বিদায় দেওয়া হলো। শৈবালও তাদের পেছন পেছন যাওয়ার চিন্তা করল। সেও যুদ্ধ করবে। দেশ স্বাধীন করবে। শৈবাল পেছনের দরজা দিয়ে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেকখানি পথ বিনু ও নিতাইদের পেছন পেছন গেল। বিনু ও নিতাই যখন নৌকায় করে নদী পার হবে তখন শৈবাল তাদের বলল— 'বিনু মামা দাঁড়াও আমিও তোমাদের সাথে যাব' বিনু ও নিতাই শৈবালকে দেখে অবাক। নিতাই বলল— 'তুমি এলে কখন? আর তুমি কোথায় যাওয়ার কথা বলছ? শৈবাল তখন বলল 'আমিও তোমাদের সাথে যুদ্ধে যাব'। শৈবালের কথা শুনে বিনু ও নিতাই অবাক, তারা ওকে নিতে চাচ্ছে না কিন্তু শৈবালও নাছোড়বান্দা। সে ফেরত যাবেই না। উপায় না পেয়ে শৈবালকেও তারা সাথে নিলো। বিনু ও নিতাই একটু দূরিত্যয় পড়ে গেল। শৈবালের মামা শৈবালকে দেখলে তো অনেক রেগে যাবে, তাই-ই হলো। শৈবালকে নিয়ে বিনু ও নিতাই যখন ক্যাম্পে পৌঁছাল,

শৈবালকে দেখে তার মামা রেগে গেল। সে বিনু ও নিতাই-এ উপর অনেক রাগ করল। সে তখনই শৈবালকে ফেরত পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল কিন্তু শৈবাল কিছুতেই ফিরে যাবে না। সে যুদ্ধে যাবেই। শৈবালের এমন আগ্রহ দেখে কমান্ডার তাকে রাখার নির্দেশ দিলেন। কমান্ডার নিজে শৈবালকে প্রশিক্ষণ দেয়। এক পর্যায়ে শৈবাল গ্নেনেড নিক্ষেপে পারদর্শী হয়ে উঠে। তাকে কয়েকটি মিশনেও পাঠানো হয়। সে সফলভাবে মিশনগুলোতে গ্নেনেড নিক্ষেপ করে। এভাবে ৩/৪টি মিশনের পর একদিন তারা খোঁজ পায় পাশের গ্রাম রাজাকার ও পাকিস্তানিরা দখল করেছে। তারা গ্রামের কিছু মহিলাদের আটকে রেখেছে। কমান্ডার সাহেব নির্দেশ দিলেন গ্রামটিতে উদ্ধার অভিযান চালাতে হবে, সবাই প্রস্তুত। চারদিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণের পরিকল্পনা করে কিন্তু এটা ছিল রাজাকারদের ফাঁদ। রাজাকাররা পরিকল্পনা করে মুক্তিসেনাদের মারার ফাঁদ পেতেছে। মুক্তিসেনারা যখন রাজাকারদের আস্তানায় হামলা করে তখনই প্রস্তুত রাজাকার বাহিনীরা পেছন থেকে আক্রমণ করে। চারজন মুক্তিসেনা মারা যায়। গোলাগুলি চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্য শৈবালের মামা গুরুতর আহত হয়। শৈবাল এসে তাকে ধরে এক পাশে বসায় এবং তার মামার বন্দুক হাতে নিয়ে গুলি চালানো শুরু করলো। কীভাবে গুলি চালাতে হয় এ বিষয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষা আছে। শৈবালের পাশেই ছিল নিতাই। শৈবাল নিতাইকে বলল 'তুমি মামাকে নিয়ে ক্যাম্পে ফেরত যাও।' নিতাই শৈবালের মামাকে নিয়ে ক্যাম্পে যেতে যেতে কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝতে পারল গুলিবর্ষণ কিছুটা কমেছে। শৈবালের সাথে যে সঙ্গী ছিল সে গুলি লেগে নিহত হয়েছে, আর শৈবাল ধরা পরেছে। শৈবাল কিছুদিন পাকবাহিনীর কাছে বন্দি ছিল তারপর শৈবালকেও কোনো এক বন্ধুত্বমতে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

এভাবেই বাঙালির অনেক বীর সন্তানকে হত্যা করেছে পাকবাহিনী। সন্তান হারা করেছে আশরাফ সাহেবের মতো আরো অনেক পিতাকে। সেই বীর সন্তানরাই শহিদ হয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। ■

লেখক পরিচিতি: শিক্ষার্থী

## ছোটদের ছড়া

### বঙ্গবন্ধু

মো. আবু বকর

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান  
তুমি শেখ মুজিবুর রহমান  
বিশ্ববাসীর মহান নেতা  
তুমি চির অম্লান।  
বাঙালি জাতির গর্ব তুমি  
বল্লকষ্ঠের অগ্নি পুরুষ  
তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছিল  
বাংলাদেশের সব মানুষ।  
গরিব-দুখির বন্ধু তুমি  
ন্যায়ের পথের পথিক  
তোমার তুলনা তুমিই শুধু  
চেতনা তোমার সঠিক।

ছাদশ শ্রেণি, বাগাতিপাড়া ডিগ্রি কলেজ, নাটোর

### আমার স্বাধীনতা

মো. রিফাত হোসেন

স্বাধীনতা তুমি রক্তে রাঙানো  
একটি গোলাপ ফুল

স্বাধীনতা তুমি  
বীর সৈনিকের উজ্জ্বল সূর্য শিখা

স্বাধীনতা তুমি  
সবুজের মাঝে রক্তে মাখা পতাকা।

স্বাধীনতা তুমি  
উনিশ শতকের একত্তরের কথা

স্বাধীনতা তুমি  
ঘোলোই ডিসেম্বরে বিজয়ের মালা গাঁথা।

নবম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

### সোনার বাংলাদেশ

সাকিবুল ইসলাম

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে  
মুক্ত করল দেশ  
পেলাম মোরা লাল-সবুজের  
প্রিয় সোনার বাংলাদেশ।  
স্বাধীনতার জন্য তারা  
দিয়ে গেলেন প্রাণ  
জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে  
রাখল দেশের মান।

৮ম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর এ আর উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

### স্বাধীনতা

রুপা আজার

সবুজ-শ্যামল দেশটি মোরা  
পেলাম যাদের কারণে  
তারা সবাই আছেন বেঁচে  
বাঙালির হৃদয় কোণে  
বছর শেষে ফিরে এল  
স্বাধীনতার মহান মাস  
দেশটা হলো পুণ্যভূমি  
বীর শহিদদের বসবাস।

৮ম শ্রেণি, বারহাটা উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা





বঙ্গবন্ধু নামেই সবাই তাঁকে চিনে। পুরো নাম শেখ মুজিবুর রহমান। শুধু একটি নাম নয়। একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি থাকবে, এ দেশের জনগণ থাকবে, ততদিনই অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে বঙ্গবন্ধু থাকবেন সবার মাঝে। মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি বিশ্বকে করেছেন আলোকিত। তাই আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে বলিয়ান হয়ে বেড়ে উঠতে পারে, সে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। বন্ধুরা, নানা উৎসবে, আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী আমরা পালন করছি। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বালেন্দা গ্রামে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদ'।

১০০ বিঘা আয়তনের ধানক্ষেতের বিশাল 'ক্যানভাসে' ফুটিয়ে তোলা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নান্দনিক প্রতিকৃতি। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু'।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ফুটিয়ে তুলতে ২৯শে জানুয়ারি চীন থেকে আনা ডিপ ভায়োলেট রঙের হাইব্রিড ও দেশের ডিপ গ্রিন ধানের চারা রোপণ করা হয়। সেই চারাগুলো বড়ো হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে রূপ নেয়। গত ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ এই ধানের চারা গাছগুলো লাগানো হয়। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো 'শস্যচিত্রে বঙ্গবন্ধু' গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের দুই প্রতিনিধি গত ৯ই মার্চ পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট দাখিল করেন। সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ আমাদের মহান নেতাকে নিয়ে এই আনন্দের ঘোষণাটি দেয়।

এ খবরে সারা দেশের মতো বগুড়াবাসীকেও আনন্দিত করে। বিশ্বে এখন সবচেয়ে বড়ো শস্যচিত্রটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গড়া শস্যচিত্র। এর আগে ছিল চীনের তৈরি করা শস্যচিত্র। যার আয়তন ছিল আট লাখ ৫৫ হাজার ৭৮৬ বর্গফুট। আর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে করা শস্যচিত্রটির আয়তন ১২ লাখ ৯২ হাজার বর্গফুট বা এক লাখ ২০ হাজার বর্গমিটার। ■



## দশদিগন্ত সাদিয়া ইফফাত আঁখি



### 'মুজিব ১০০' অ্যাপ

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে চালু হলো 'মুজিব ১০০' অ্যাপ। ১৪ই মার্চ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অ্যাপটির উদ্বোধন করেন। বঙ্গুরা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে অ্যাপটি। অ্যাপটি নির্মাণ করেছে আইসিটি বিভাগ। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে (mujib100.gov.bd) নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই ওয়েবসাইটটি মোবাইল সংস্করণ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে 'মুজিব ১০০' অ্যাপ। বঙ্গুরা, খুব সহজেই তোমরা গুগল এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবে। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি।



### বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার

বঙ্গুরা, মুজিববর্ষে তোমাদের জন্য একটি সুখবর আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার চালু করেছে ইউনেস্কো। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)-এ পুরস্কার চালু করে। পুরস্কারের নাম 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্য ফিল্ড অফ ক্রিয়েটিভ ইকোনমি'। এ পুরস্কার বিশ্বের সংস্কৃতি কর্মীদের সৃজনশীল বিকাশে অনুপ্রেরণা জোগাবে। ইউনেস্কো নির্বাহী পরিষদের শরৎকালীন ২১০ তম অধিবেশনে এ পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এ ভাষণটি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতি ২ বছর পর পর এ পুরস্কার দেওয়া হবে। এর মূল্যমান ৫০ হাজার মার্কিন ডলার।



### বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তিন ভাষায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ তিনটি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। ভাষা তিনটি হলো— আইরিশ, স্কটিশ এবং ওয়েলস ভাষা। লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনে এই ভাষণ প্রকাশ করা হয়। এই বিশেষ ভাষণ অনুবাদ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের মানুষের কাছে তুলে ধরবে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ জাতিসংঘের সব কয়টি দাপ্তরিক ভাষাসহ মোট ১৭টি ভাষায় প্রকাশিত হলো।



### বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উপহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং দেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পিতলের তৈরি বঙ্গবন্ধুর একটি ম্যুরাল উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত লি জি মিং। ১৫ই মার্চ গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন চীনের রাষ্ট্রদূত। এ সময় চীনা দূতাবাসের পক্ষে শেখ হাসিনার হাতে ম্যুরাল তুলে দেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনা দূতাবাসের প্রশংসা করেন।

## লাখো খুদে কণ্ঠে ৭ই মার্চের ভাষণ

খুলনায় ১ লাখ ৫০ হাজার ১৫১ জন শিশুর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রত্যক্ষ ও জুম ওয়েবিনিয়ারের মাধ্যমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর বয়রা এলাকায় সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিশু কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ। সাথে ছিল জুম অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকের পরনে ছিল বঙ্গবন্ধুর মতো সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা ও মুজিবকোট।



## বিশ্বরেকর্ড গড়তে আলপনা

মিনহাজুল আবেদীন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখাতে গাইবান্ধায় টানা ২৪ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার সড়কে দীর্ঘতম আলপনা আঁকা শুরু হয় উৎসবমুখর পরিবেশে। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম আলপনা। গাইবান্ধা জেলা শিক্ষার্থীদের সংগঠন পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব গাইবান্ধা (পুসাগ)-এর শিক্ষার্থী শিল্পীরা ১৮ই মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে আলপনা আঁকা শুরু হয়ে। ১৯শে মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ২৪

ঘণ্টায় সম্পন্ন করে বিশ্বের দীর্ঘতম ১০ কিলোমিটার সড়কের এই আলপনা।

সুবর্ণ জয়ন্তীতে আলপনার রঙে মেতে উঠুক ছোটো বড়ো সবাই। 'দেখবে গাইবান্ধা, দেখবে দেশ; রেকর্ড করবে বাংলাদেশ' এই স্লোগানে আলপনা উৎসবে মেতে উঠে শত শত শিক্ষার্থীরা। তাদের উদ্দেশ্য ২৪ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার সড়কে আলপনা আঁকা সম্পন্ন করে গিনিস বকের রেকর্ডে বিশ্বে দীর্ঘতম আলপনা আঁকা সড়ক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া।

দ্বাদশ শ্রেণি, কমার্স কলেজ, ঢাকা



## নবাবরণ

সচ্ছিন্ন কিশোর মাসিক পত্রিকা



নবাবরণ-এর  
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা  
মান্বাসিক ১২০.০০ টাকা  
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপস-এ  
নবাবরণ পড়তে  
স্মার্ট ফোন থেকে  
google play store-এ  
nobarun লিখে  
মোবাইল অ্যাপস  
ডাউনলোড করুন।

নবাবরণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।  
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।  
e-mail: [editornobarun@dfp.gov.bd](mailto:editornobarun@dfp.gov.bd)

## অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%  
এজেট কমিশন : ৩৩%



বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ  
বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে  
আউপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের  
সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,০০০ টাকা  
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা) : ৭৫০ টাকা  
বাংলাদেশের বন্যজাতি (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা  
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা) : ৭৫০ টাকা  
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা  
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : ফুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা  
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন  
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)  
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর  
তথ্য ভবন  
১১২, সার্ভিস হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫৭৪৯০  
৯৩৬৩৫৫৩৩ সচিব বাংলাদেশ, নবাবরণ ও বাংলাদেশ কোয়ালিটি সার্ভিস  
[www.dfp.gov.bd](http://www.dfp.gov.bd)



করোনার বিস্তার প্রতিরোধে  
**নো মাস্ক নো সার্ভিস**  
মাস্ক নাই তো সেবাও নাই  
মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি  
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

 চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-9, March 2021, Tk-20.00



চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর  
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
তথ্য ভবন  
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা